অভীক দত্ত

ব্লু ফ্লাওয়ার

অভীক দত্ত

প্রথম সংস্করণ- অগাস্ট ২০১৮

Blue Flower By Abhik Dutta
Cover By Tousif Haque
Price 200 Inr

১।

এটিএম ফাঁকা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বাইক থেকে নেমে এটিএমের সামনে গিয়ে বীরেন দেখল ভেতরে একটা ছেলে আছে।

বীরেন ভাবল ঠিক আছে। চাপ নেই। কতক্ষণ আর লাগবে।

মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর তার টনক নড়ল। একটু উঁকি মেরে ভেতরের দিকে তাকিয়ে থেকে দেখল ছেলেটা বার বার বিভিন্ন এটিএম কার্ড ঢোকাচ্ছে আর এটিএম "ব্যাড পিন" এরর দেখাচ্ছে। ছেলেটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বীরেন এবার ছেলেটাকে দেখা চেষ্টা করল। রোগা পাতলা ছেলে। থ্রি কোয়ার্টার পরা। দাড়ি গোঁফ নেই। বীরেন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে বলল "ওভাবে হয় না"।

ছেলেটা চমকে তার দিকে তাকাল। দৌড়ে পালাতে যাচ্ছিল বীরেন শক্ত হাতে ছেলেটার হাত ধরল।

ছেলেটা চেষ্টা করছিল হাতটা ছাড়াতে। বীরেন ধরে বলল "মানিব্যাগটা কোথায় পেয়েছিস?"

ছেলেটা ছটফট করতে করতে বলল "ছাইড়া দ্যান"।

বীরেন বুঝল ছেলেটা বাংলাদেশী। এলাকায় আজকাল এদেরই দৌরাত্ম্য। গোলাপট্টিতে আসে ছেলেগুলো, প্রথমে একটা পরিবার আসে। এলাকার মাথাদের টাকা খাইয়ে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড করে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে এক এক করে লোক আনতে থাকে ওদেশ থেকে। একইভাবে এরা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ছেলেগুলো দশটাকার জন্য মানুষ খুন করতে পারে।

বীরেন বলল "কোথায় মেরেছিস মানিব্যাগটা? এটিএমে ক্যামেরা থাকে জানিস?"

ছেলেটা এবার একটা জোরে ঝটকা দিল। মানিব্যাগটা মেঝেতে পড়ে গেল। মেঝের মধ্যে অনেকগুলো কার্ড ছড়িয়ে পড়েছে। বীরেনের হাত ছাড়িয়ে দৌড় মারল ছেলেটা।

বীরেন দৌড়াল না আর। সে কার্ডগুলো মানিব্যাগে ঢুকিয়ে নিজের টাকা তুলল। মানিব্যাগটা একটু খুঁজতেই একটা কার্ড পাওয়া গেল।

বীরেন দেখল নাম লেখা সায়ক বড়াল, ঠিকানা কলকাতার। মানিব্যাগটা হাতড়ালো বীরেন। তেমন কিছুই পাওয়া গেল না।

কী মনে হতে একটা কার্ড বের করে এটিএমে ঢোকাল। নিজের পিনটাই দিল। দশ হাজার টাকা উইথড্র করল। টাকা বেরিয়ে এল।

চমকাল সে। খানিকটা ঘোরের মধ্যেই ব্যাপারটা করেছিল সে। ভাবতেও পারে নি টাকা চলে আসবে। এটিএমের স্লিপ বেরিয়ে এসেছে। অ্যাকাউন্ট ব্যালান্সের অংকটা দেখে মাথা ঘুরে গেল। প্রায় পঁচিশ লাখ টাকা আছে অ্যাকাউন্টে। বীরেন অন্য একটা কার্ড ঢোকাল মেশিনে। আগের পিনটাই দিল। একইভাবে

দশহাজারটাকা বেরিয়ে এল। এটিএমের প্রবল এসিতেও ঘাম ঝরছিল তার। এই কার্ডের ব্যালান্স কোটিরও বেশি। সে টাকাগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এটিএমের ভিতর।

২।

প্রচণ্ড ভিড় ট্রেনে। ঘাম ঝরছিল খুব।

বীরেন কোন মতে এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। কল্যাণী লোকালে ভিড়ের কোন মা বাপ নেই। অফিস টাইমেও ভিড় থাকে, অফিস টাইম না থাকলেও ভিড় থাকে। এগারোটা চোদ্দর লোকালে ভালই ভিড়। ব্যাগটা ধরে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাগের মধ্যে মানিব্যাগটা।

বাড়ি ফিরে বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল বীরেন। প্রথমে ভেবেছিল থানায় দিয়ে আসবে মানিব্যাগটা। তারপরে মনে হল পুলিশ একগাদা প্রশ্ন করতে পারে। যদি জিজ্ঞেস করে কুড়ি হাজারটাকা তুলেছে কেন তাহলে কী উত্তর দেবে? হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল। এটিএমে ক্যামেরা থাকে। যার টাকা সে অভিযোগ করলে কী হবে? তার তো ছবি উঠে গেছে নিশ্চয়ই। হুলিয়া বেরিয়ে যাবে তার নামে। ছটফট করছিল বীরেন। মানিব্যাগে কোন ফোন নাম্বার নেই। তবে একটা ঠিকানা আছে। ঠিক করল যার ব্যাগ তার কাছেই টাকা আর ব্যাগ ফেরত দিয়ে আসবে। ভাবামাত্রই আর দেরী করে নি সে। বাইকটা স্টেশনের কাছে ভবানীদার গ্যারেজে রেখে চোখ বুজে ট্রেনে উঠে পড়েছে।

বাবা ডেলিপ্যাসেঞ্জার ছিলেন। রিটায়ারমেন্টের পর ঘরে বসে প্রায়ই গল্প করেন কল্যাণী লোকালের। বার তিনেক পকেটমার হয়েছিল বাবার। বীরেনের সেসব গল্প মগজে গাঁথা হয়ে আছে। একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছিল সে। ট্রেনের মধ্যে একটা বিতিকিচ্ছিরি ঘেমো গন্ধ। মাঝে মাঝেই গা গুলিয়ে উঠছে। এর ফাঁকেই বেশ কিছু লোক ব্রিফকেস পেতে জমিয়ে তাস খেলছে। এক যুগল ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করে কথা বলছে। বেশ কিছু মহিলা এক গাদা বস্তা নিয়ে গেটটা জাম করে জোরে জোরে গল্প করছে। একজন হকার উঠে এক পৃথিবী বকবক শুরু করে দিয়েছে। বীরেন একটু লক্ষ্য করে দেখল হজমিগুলি বিক্রি করতে উঠেছে।

নাকটা চুলকাচ্ছে। বীরেন প্রমাদ গুনল। অ্যালার্জি অ্যাটাক এখন শুরু হলে চিত্তির। ডাস্ট অ্যালার্জি আছে তার। পর পর হাঁচি শুরু হলে থামতেই চায় না। প্রাণপণে অন্য কিছু ভাবতে শুরু করল সে। অ্যালার্জির কথা ভাবলে অ্যালার্জি আসবেই। কিছুতেই আটকানো যাবে না।

ট্রেন বারাসাত দাঁড়িয়েছে। ভেবেছিল বারাসাত থেকে খালি হবে খানিকটা। ব্যাপারটা উলটো হল। ভিড় বাড়ছে। কেউ একজন পা মাড়িয়ে চলে গেল। বীরেন পারছিল না। ট্রেন সবে ছেড়েছিল। ভিড় ঠেলে চলন্ত ট্রেন থেকেই স্টেশনে নেমে পড়ল। স্টেশনে যে ক'জন দাঁড়িয়ে ছিল রে রে করে উঠল। বীরেন কান দিল না। কোন দিকে না তাকিয়ে ওভারব্রিজের দিকে জোর পায়ে হাঁটা দিল। ওভারব্রিজের সিঁড়িতেই ফোনটা শব্দ করে বেজে উঠল। বীরেন ফোন বের করে দেখল অরিত্রি ফোন করছে। ধরল "বল"।

"কোথায় তুই?" অরিত্রির গলায় উদ্বেগ।

বীরেন বলল "বারাসাতে"।

"বারাসাতে? কী করছিস বারাসাতে?"

বীরেন বলল "কোলকাতা যাচ্ছি। একটা জরুরি কাজে। কেন বলত?"

"তোকে বার বার বলেছিলাম আজ রজত আসবে"।

বীরেন অবাক গলায় বলল "রজত কে?"

অরিত্রি রেগে গেল "পাগল নাকি তুই? রজত আমার উড বি। ভুলে গেছিস সব?"

বীরেন বলল "ওহ। আচ্ছা আসবে আমি কী করব?"

অরিত্রি বলল "তোর আমাকে নিয়ে যাবার কথা ছিল না বাইকে?"

বীরেন বলল "তোর বাড়ির সামনে দিয়ে অটো ছাড়ে তো। চলে যা"।

অরিত্রি রেগে মেগে ফোন কেটে দিল। রাগবারই কথা। আগে থেকেই কথা হয়ে ছিল রজত এলে বীরেন নিয়ে যাবে। এভাবে ভুলে মেরে দেবে বীরেন, অরিত্রি কী করে বুঝবে?

বীরেন বারাসাত স্টেশন থেকে বেরিয়ে চাপাডালি পর্যন্ত একটা রিক্সা নিল। সায়ক বড়ালের ঠিকানাটা একবার মনে করে নিল সে।

একটা ফাঁকা বাসে উঠে জানলার ধারে গিয়ে বসল। ঠিক করল এয়ারপোর্টের কাছে পৌঁছে বাস থেকে নেমে ট্যাক্সি ধরবে।

৩।

গোপালের মেজাজ ভাল ছিল না। একে প্যাচপ্যাচে গরম। তার ওপর মেসবাড়ির ছেলেগুলো হাজার গন্ডা বাকি রেখে দিয়েছে। সকালে খাতা নিয়ে বসেছিল। হিসেব দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। গ্লাস ভর্তি জল নিজের মাথাতেই ঢেলে তার ওপরে গামছা রেখে বসেছিল। মশারির জালে ভাতের ফ্যান গালা হচ্ছে। একটু পরেই মেসবাড়ির ছেলেগুলো খেতে আসবে।

গোপাল যে কড়া কড়া কথাগুলো বলবে, সেগুলোই মাথার মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্র্যাক্টিস করছিল। ঠিক করে নিয়েছে, আজকের পরেও যদি ছেলেগুলো বিল না দেয়, তবে এরপরে ডালের মধ্যে কাস্টর অয়েল মিশিয়ে দেবে। পাড়ার নেদি বেড়ালটাকে মেরে চিলি চিকেনে মিশিয়ে ছেলেগুলোকে খাইয়ে দেবে। ঝুপড়িতে বসে এসবই সাত পাঁচ প্ল্যান আঁটছিল সে এমন সময় একটা ছেলে ঘামতে ঘামতে তার কাছে এসে বলল "দেখুন তো দাদা, এই ৮/২ পশুপতি মল্লিক স্ট্রীটটা কোথায় হবে?"

গোপাল ভাল করে ছেলেটাকে মাপল। এই খোবড়া আগে দেখে নি সে। নতুন এসেছে এলাকায়। সে অন্যমনস্ক গলায় ছেলেটাকে জরিপ চালিয়ে যেতে যেতে বলল "কার বাড়ি বলুন না"।

ছেলেটা বলল "সায়ক বড়াল"।

গোপাল ভ্রু কুঁচকে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল "সে আবার কে? এই পাড়ায় থাকে নাকি?"

ছেলেটা একটা কাগজ দেখে বলল "হ্যাঁ, এই ঠিকানাই তো দেখছি"।

গোপাল চিন্তিত গলায় বলল "ঠিকানাটা কী বললেন যেন?"

ছেলেটা বলল "৮/২ পশুপতি..."

গোপাল বলল "৮/২ তো ওই লাল বাড়িটা ছেড়ে দুটো বাড়ি পরে। কিন্তু সে তো ভট্টাচার্যদের বাড়ি। সায়ক বড়াল বলে তো কেউ থাকে না!"

ছেলেটা কয়েক সেকেন্ড গোপালের দিকে তাকিয়ে আর একটাও কথা না বাড়িয়ে উলটো দিকে ঘুরে হাঁটা লাগাল।

গোপাল গজগজ করতে লাগল "কোত্থেকে আসে কে জানে"।

মেসবাড়ির ছেলেগুলো আসছে, গোপালের আবার মাথা গরম হয়ে গেল।

পাঁচটা ছেলে আসে। একটার আবার মুখে ফ্রেঞ্চকাট, চুলে হাইলাইট করা। এটারই সব থেকে বেশি দেনা। গোপাল বিড় বিড় করল "বাপের পোঁদে বাল নেই, ছেলে রেখেছে ফ্রেঞ্চকাট"।

ছেলেগুলো নিজেদের মধ্যে খিক খিক করতে করতে বেঞ্চিতে বসে পড়ল। গোপাল গম্ভীর গলায় বলল "টোটাল সাত হাজার আটশো টাকা হয়েছে তোমাদের। কবে দেবে?"

ফ্রেঞ্চকাট পকেট থেকে পাঁচটা দুহাজার টাকার নোট বের করে একটা ছেলেকে দিয়ে বলল "দিয়ে দে"।

ছেলেটা গোপালের হাতে দশ হাজারটাকা দিল। ফ্রেঞ্চকাট বলল "বাকিটাকাটা তোমার টিপস। পুজোয় জাঙ্গিয়া কিনো"।

বাকি ছেলেগুলো খিক খিক করে হেসে উঠল।

গোপালের মুখটা হাঁ হয়ে গেছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে কিছুতেই হাঁ-টা বন্ধ করার কথা ভাবতেই পারছিল না।

৪।

মিনি ঘুম থেকে উঠেছে দুপুর দেড়টায়। মা মামার বাড়ি গেলে মিনি সাপের পাঁচ পা দেখে। মামীর শরীর খারাপের খবর আসায় মা মামা বাড়ি গেছে। দুদিনের ধাক্কা। কাকিমাকে মিনি বলেই রেখেছিল জাগাতে এলে খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে। কাকিমা অবশ্য মিনিকে মার মত বেশি বকে ঝকে না। বরং উলটো। টাকা পয়সা, এটা সেটা কাকিমাই তাকে ম্যানেজ করে দেয়।

আজকেও কাকিমা বেশি ঘাটায় নি তাকে। তবে সাড়ে বারোটা বাজতে দেখে আর পারে নি। দরজায় বিজর মাকে ধাক্কা দিতে বলেছিল।

মিনি উঠে ঘড়ি দেখে একবার জিভ কেটেছে। তারপর উলো ঝুলো চুলে নাইটি পরেই খানিকক্ষণ খাটে বসে ঢুলতে ঢুলতে কাকিমার ঘরে গিয়ে কাকিমাকে আদুরে বেড়ালের মত জড়িয়ে ধরেছে।

কাকিমা কপট রাগে বলল "রাজকন্যের ঘুম ভাঙল?"

মিনি বলল "হু"।

কাকিমা বলল "তোর মা ফোন করেছিল দুবার"।

মিনি বলল "কী বললে?"

কাকিমা বলল "কী আর বলব। একবার বললাম স্নানে গেছিস, আরেকবার বললাম পড়ছিস"।

মিনি হিহি করে খানিকক্ষণ হেসে বলল "তোমার অনেকগুলো চুমকা পাওনা হয়ে গেল"।

কাকিমা বলল "তা তো হলই। আচ্ছা, আমাকে বল তো অত রাত জেগে কী করিস মোবাইলে? কোনো ছোড়াকে জুটিয়েছিস নাকি?"

মিনি ভুরু নাচিয়ে বলল "উহু, আমি কাউকে জুটাই না বুঝলে? আমার জন্যই সবাই পাগল"।

কাকিমা মিনির নাক টিপে বলল "তা তো হবেই। এমন সুন্দরীর জন্য সবাই তো পাগল হবেই। তবে এখন এমন বান্দরী সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? যা গিয়ে মুখ টুখ ধুয়ে নে। স্নানটাও সার। হ্যাঁরে, এই যে তুই আজ কলেজে গেলি না, কেউ কিছু বলবে না?"

মিনি বলল "ধুস, কী যে বল। আমি তো শুধু একদিন ডুব মারলাম। রোজই তো যাই"।

কাকিমা বলল "আমি কিন্তু জানি না, দিদি কিছু বললে তুই বুঝবি"।

মিনি হাই তুলে বলল "দুপুরে কী খাওয়াচ্ছো? খেয়ে দেয়ে আবার ঘুমাব ভাবছি"।
কাকিমা বড় বড় চোখ করে মিনির দিকে তাকিয়ে বলল "মানে? আবার ঘুমাবি?"
মিনি বলল "হ্যাঁ, আজ ঘুম ডে। সারাদিন ঘুমাব। বাবা অফিস থেকে ফিরে আসার আগে ডেকে দিও তাহলেই হবে"।
কাকিমা বলল "আমি জানিনা বাপু, তুই যা শুরু করেছিস, খুব শিগগিরি কুম্ভকর্ণশ্রী পুরস্কার দেবে তোকে পিসি"।
মিনি বলল "দিক না। খুব ভাল হবে। কিন্তু ওখানে গিয়ে ঘুমিয়ে দেখাতে হবে না তো? ধর একটা দারুণ এসি রুম দিল, আর সুন্দর একটা বিছানা। গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, গোটা বাংলার লোক দেখল, পিসি খুশি হয়ে আমাকে একটা এক্সট্রা সাইকেল গিফট করে দিল, সাইকেলে আবার স্পেশাল বালিশ লাগানো থাকবে, সাইকেল চালাতে চালাতেও যেন ঘুমানো যায় সেই সিস্টেম থাকবে"।
কাকিমা হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল "উফ তুই পারিসও বটে। মাথাতেও আসে তোর"।
বিশুর মা এসে কাকিমাকে বলল "দিদি, দোতলায় কর্তাবাবুর খাবারটা দিয়ে আসব?"
কাকিমা হাঁ হয়ে বলল "সেকী গো, তোমাকে তো সেই কখন বললাম, এখনও দিলে না?"
বিশুর মা তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল। কাকিমা উঠল "দেখেছিস তো, একটু বসার জো নেই, দাদার খাবারটা দিতে বললাম, ভুলে মেরে দিয়েছে"।
মিনি বলল "বিশুর মা তো মোবাইল ইউজ করছে। রিমাইন্ডার সেট করে দিও যে এই টাইমে জেঠুকে খাবার দিয়ে আসতে হবে। তাহলেই হল"। কাকিমা বলল "তাই করতে হবে। জানিস সেদিন দেখি হোয়াটস অ্যাপ করছে কাকে"।
মিনি হাঁ করে বলল "বল কী গো"।
কাকিমা বলল "তা আবার বলছি কী! জিজ্ঞেস করতে বলল বিশুর বউ শিখিয়ে দিয়েছে। বিশুর মা ক্লাস টেন পাস জানিস তো?"
মিনি বলল "হ্যাঁ, ভাল বাড়ির মহিলা দেখলে বোঝা যায়"।
কাকিমা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কলিং বেল বেজে উঠল।
কাকিমা বলল "দেখ তো কে এল, আমি রান্নাঘরের দিকে গেলাম"। মিনি ব্যাজার মুখে বলল "বিশুর মাকে বল না দেখতে"। কাকিমা বলল "যা না মা, ওদিকে না গেলে আবার দাদাকে কী দিতে কী দিয়ে দেবে, আবার রাগারাগি শুরু হয়ে যাবে। দেখ দেখ, আমার মনে হয় লন্ড্রিওয়ালাটা হবে। কাপড়গুলো বুঝে নিস"।

মিনি বিরক্ত মুখে হাই তুলতে তুলতে উঠে বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলল। একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ ঘেমেছে ছেলেটা। সে ভাবল সেলসম্যান হবে। মুখে বিরক্তির ভাবটা বজায় রেখে বলল "আমাদের কিছু লাগবে না। আপনি আসুন"।
ছেলেটা একটা ক্যাবলা হাসি হেসে বলল "আমি কিছু বিক্রি করতে আসি নি, একটা জিনিস জানতে এসেছি। সায়ক বড়াল নামে কি কেউ এই বাড়িতে থাকেন?"
মিনি বলল "নাহ, এই নামে কেউ এই বাড়িতে থাকে না"।
ছেলেটা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে দেখতেই বসে পড়ল। চোখে কেমন একটা শূন্য দৃষ্টি।
মিনি অবাক হয়ে বলল "একী! আপনি এখানেই বসে পড়লেন যে!"
ছেলেটা ভাঙা গলায় বলল "আমি অনেক দূর থেকে আসছি। একটা বিরাট সমস্যায় পড়ে গেছি। কী করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না"।
ছেলেটার অবস্থা দেখে মিনির করুণা হচ্ছিল। আবার ভয়ও হচ্ছিল, আজকাল অনেক খবর শোনা যায় লোকের বাড়িতে গুন্ডেরা ঢুকে খুন টুন করে চলে যায়। সে বলল "আপনি একটু বাইরের বসার জায়গাটায় বসুন আমি কাকিমাকে ডেকে দিচ্ছি"।
ছেলেটা ধীরে ধীরে উঠে দরজার বাইরের বসার জায়গাটায় গিয়ে বসল।
মিনি দরজা বন্ধ করে রান্না ঘরে গেল। কাকিমা জেঠুর ভাত বেড়ে দিচ্ছিল থালায়। তাকে দেখে বলল "দিল কাপড়?"
মিনি বলল "লন্ড্রি না কাকিমা। একটা ছেলে"।
কাকিমা অবাক গলায় বলল "ছেলে মানে? কী চায়?"
মিনি বলল "কে জানে। একটু দেখো না"।
কাকিমা বলল "ঘরে বসিয়েছিস নাকি?"
মিনি বলল "না না বাইরের বেঞ্চে বসেছে। বলছে অনেক দূর থেকে এসেছে। কী একজনের নাম বলে বলছে এই নামে কি এই বাড়িতে কেউ থাকে? না বলায় কেমন থতমত খেয়ে গেল। একবার দেখো না প্লিজ"।
কাকিমা বিরক্ত গলায় বলল "উফ, পাগল হয়ে যাব। ঘরের চাপ, বাইরের চাপ, কোন দিকে যে যাব। এক কাজ কর, এই থালায় বেগুন ভাজা আর কুমড়োর তরকারিটা দিয়ে বিজুর মাকে বল জেঠুকে দিয়ে আসতে। আমি দেখছি কে এল"।
মিনি বলল "তাই হোক। তুমি দেখে এসো কী ব্যাপার"।
কাকিমা তার হাতে থালাটা দিয়ে ঘর থেকে বেরোল।

৫।
জ্যোতির্ময় টিভি দেখছিলেন।
স্নান করার পর থেকেই খিদে পেয়ে যায়। বিজুর মা যথারীতি ভুলে গেছে।

খানিকটা বিরক্ত বোধ করছিলেন জ্যোতির্ময়। এই জন্যই বোধহয় বউয়ের দরকার। ভাইবউরা যত ভালই হোক, খিদের সময় ভাত দিতে দেরী হবেই। নিজের বউ থাকলে সে সমস্যাটা থাকে না। কোই, মেজো সোমেন কিংবা ছোট তাপসের বেলায় তো খাবার দিতে দেরী হয় না! অথচ সংসারে তার কন্ট্রিবিউশন কোন অংশে কম? বরং বেশিই বলা চলে।

দোতলার টেবিলে গ্লাসে জল ভরে রেখে দুগ্লাস জল খেয়ে জ্যোতির্ময় টিভির দিকে নজর রাখছিলেন। টিসিএস উঠছে, লাখ খানেক টাকার টিসিএসের শেয়ার কিনেছিলেন ছ সাত মাস আগে। শেয়ারের দাম বেশ খানিকটা বেড়েছে। কিন্তু নতুন শেয়ার কিনবেন বলে ঠিক করছিলেন মনে মনে।

দরজায় নক হল। জ্যোতির্ময় বুঝলেন বিশুর মা এসেছে। সামান্য গলা তুলে বললেন "দরজা খোলাই আছে"।

বিশুর মা দরজা ঠেলে ঢুকল।

টেবিলে খাবার রেখে চলে গেল।

জ্যোতির্ময়ের নিক্তিতে মাপা ভাত। একটা ছোট বাটিতে যতটা ভাত ওঠে ঠিক ততটাই ভাত খান তিনি। ভাতে হাত রেখে কয়েক সেকেন্ড ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে খাওয়া শুরু করলেন জ্যোতির্ময়।

খেতে বেশিক্ষণ লাগে না। খেয়ে দেয়ে পোশাক পরে বাইরে বেরোন তিনটে নাগাদ। কিছু কাজ থাকে, সেগুলো মিটিয়ে বিকেলের মধ্যে ঘরে ঢুকে যান। কোন কোন দিন এগারোটা বারোটায় বেরোন। সারাদিন পরে রাতে বাড়িতে ঢোকেন। মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করতেন পারেন না ঠিক ভাবে। অনেকবারই ভেতরে ভেতরে ঠিক করে নেন, খাওয়া দেবার সময়ের ব্যাপারে ভাইদের কাছে বিশুর মার কমপ্লেইন করবেন, শেষ মেশ করতে পারেন নি। নির্বিবাদ, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ হিসেবেই এলাকায় পরিচিত তিনি। ভাইয়েরাও বেশ সম্মান করেন।

জ্যোতির্ময়ের ভাত খাওয়া হয়ে গেছিল। টিভির দিকে তাকিয়ে শেয়ার মার্কেট ব্রেকিং নিউজ দেখছিলেন এমন সময় মিনি এসে পড়ল তার ঘরে। ফিসফিসিয়ে বলল "ও জেঠুমণি। একটা কান্ড হয়েছে জানো?"

জ্যোতির্ময় ভ্রু কুঁচকালেন, "কী কান্ড?"

মিনি বলল "একটা ছেলে সেই ঠাকুরনগর থেকে এসেছে, বলে এইটা কি সায়ক বড়ালের বাড়ি! বোঝ! এতদিন জানতাম মিসড কল শুধু ফোনেই হয়। এ তো দেখছি ঠিকানার ক্ষেত্রেও হয়?"

জ্যোতির্ময়ের একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। ক'দিন ধরে এই স্বভাবটা হয়েছে। দুপুরে ঘন্টাখানেক ঘুম। না চাইলেও ঘুম চলে আসে। মিনির কথা শুনে জ্যোতির্ময় বললেন "তা ছেলেটাকে জল খাবার দিয়েছিস? অত দূর থেকে এসেছে"!

মিনি বলল "তুমি খেপেছ? জানি না, চিনি না, একটা লোককে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দেব? নিচে আমি কাকি আর বিজুর মা বাদে তো কেউ থাকে না। যদি কিছু করে দেয়?"

জ্যোতির্ময় রেগে গেলেন "এই রোদের দুপুরে একটা লোক তেতেপুড়ে এসেছে, আর তোরা এসব ভাবছিস। ছি ছি ছি, ভট্টাচার্যবাড়ির ঐতিহ্য নষ্ট করে দিলি একেবারে তোরা। যা, ছেলেটাকে এখানে পাঠিয়ে দে"।

মিনি অবাক গলায় বলল "একেবারে দোতলায়? তোমার মাথা ঠিক আছে তো জেঠু"?

জ্যোতির্ময় বললেন "সব ঠিক আছে। যা। দেখ গিয়ে চলে গেল কিনা"!

মিনি তড়িঘড়ি নিচে নামল। কাকিমা ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে চলেছে। মিনি গিয়ে বলল "ওনাকে জেঠু পাঠাতে বলল"।

কাকিমা বলল "তাই? দাদা পাঠাতে বলেছেন! ঠিক আছে, ওকে সিঁড়িটা দেখিয়ে দে তো মিনি"।

বীরেন দোতলায় উঠল। জ্যোতির্ময়বাবু মন দিয়ে টিভি দেখছিলেন।

তাকে দেখে বললেন "আপনি নাকি কোন একটা সমস্যায় পড়েছেন? জানতে পারি কী হয়েছে?"

মিনি দরজায় দাঁড়িয়েছিল। বীরেন সেদিকটায় একবার তাকিয়ে বলল "এই বাড়িতে সায়ক বড়াল বলে কেউ থাকেন না?"

জ্যোতির্ময়বাবু টিভির থেকে মুখ না সরিয়েই বললেন "কস্মিনকালেও নয়"। মিনি দরজায় দাঁড়িয়েছিল। জ্যোতির্ময়বাবু ধমকালেন "যা গিয়ে ওর জন্য এক গ্লাস জল আর পারলে কিছু টিফিন নিয়ে আয়। সেই সকালে বেরিয়ে এখন পৌঁছেছে। খিদে পাবে তো!"

ছেলেটা মাথা নাড়ল "আমি খেয়ে নেব ঠিক।"

জ্যোতির্ময়বাবু বললেন "এরকম বললে হয় নাকি? ভট্টাচার্যবাড়িতে কেউ দুপুরে এসেছে আর সে খালিপেটে থেকেছে, এসব আমাদের বাড়িতে হয় না"। বীরেন আর কিছু বলল না। মিনি নিচে নামল।

জ্যোতির্ময়বাবু শান্ত গলায় বললেন "মানিব্যাগ আর টাকাটা ঐ টিভি স্ট্যান্ডের তলার ড্রয়ারে রেখে দিয়ে যেভাবে বসেছিলে সেভাবেই বস যেন মিনি কিছু বুঝতে না পারে"।

বীরেন চমকে জ্যোতির্ময়বাবুর দিকে তাকাল।

জ্যোতির্ময় বললেন "লাস্ট মান্থ ডিফেন্সের এক্সামে হান্ড্রেড আর ফোর হান্ড্রেড মিটারে ফার্স্ট হয়েছিলে, সবকটা পরীক্ষাতেই এক্সপেক্টেড মার্কস পেয়েছিলে। তবু মেডিকেলে কেটে গেলে? কেন? কত টাকা চেয়েছিল ওরা তোমার কাছে?"

৬।

"কেক আছে না কাকিমা?" নিচে নামতে নামতে প্রশ্ন করল মিনি। কাকিমা ভাত বাড়ছিল। তাকে দেখে অবাক হয়ে বলল "এখন কেক খাবি নাকি?" মিনি হেসে ফেলল "ধুস, আমি কেন? জেঠু বলল ছেলেটা দুপুরবেলা এসেছে কিছু টিফিন দিতে তাই জিজ্ঞেস করলাম। বলে ভটচাজ বাড়িতে দুপুরে এসে কেউ খালিপেটে যায় না"। মিনি জেঠুর গলা নকল করল শেষটায়। কাকিমা চিন্তিত মুখে বলল "ওহ, তা এই দুপুরে তো ওই ভাত খাইয়ে দিলেই ভাল হত। এখন আবার ওসব কেকের জ্বালাতন করার কী দরকার?"

মিনি বলল "সেটাও কেমন কেমন ঠেকে না? চিনি না জানি না, এক থালা ভাত নিয়ে গিয়ে বলবে ভাত খেয়ে নাও?"

কাকিমা বলল "তাও তো ঠিক, এই কথাটা আমার মাথায় আসে নি। তাহলে আমি একবার বরং জিজ্ঞেস করে আসি"।

কাকিমা দোতলায় যাচ্ছিল মিনি কাকিমার হাত ধরে টেনে বলল "দাঁড়াও, কোথাও যেতে হবে না, আমি জেঠুকে ফোন করে দিচ্ছি"।

কাকিমা বিরক্ত মুখে বলল "নিচের ঘর থেকে ফোন করবি কেন? আমি দেখছি বললাম তো"।

মিনি বলল "ধুস, এখন সব ফ্রি ফোন। দাঁড়াও তো"।

মিনি জেঠুকে ফোন করল, একবার ডায়াল হতেই জ্যোতির্ময় ধরলেন "কী হল আবার?"

মিনি ফিসফিস করে বলল "জেঠু, কাকিমা বলছে দুপুরবেলা কেক টেকের থেকে ভাত খাইয়ে দিলে ভাল হত না?"

জ্যোতির্ময় থমকে বললেন "তাই কর, আমি ওকে নিচে যেতে বলছি, ভাত বেড়ে ফোন করে দিস"।

ফোন রেখে মিনি বলল "ওই দেখো, কাজ হয়ে গেল। ভাত বেড়ে ফেল"। কাকিমা বিশুর মার দিকে তাকালেন "ভাত বাড়ো, আমি একটা ডিম ভেজে ফেলি, বাইরের লোককে তো তোমার ওই বিখ্যাত কুমড়োর তরকারি দেওয়া যাবে না"! বিশুর মা কাকিমার কথার উত্তর না দিয়ে ভাত বাড়তে শুরু করল। মিনি ফিসফিস করে বলল "আমার জন্যেও কিন্তু একটা ডিম ভাজবে, নইলে এমন নজর দেব, ওই ছেলের বাঁ হাতের জল শুকাবে না"।

কাকিমা হাসতে হাসতে বলল "তা আর জানি না, হ্যাংলাটা আমার! যা, এবার এই উড়নচণ্ডী হয়ে ঘুরে না বেরিয়ে স্নানটা সেরে আয়"।

মিনি হাই তুলল একটা "আজ আর স্নান করব না ভাবছি"।

কাকিমা বলল "তা তুই যা ইচ্ছা কর। কিন্তু গা থেকে এরপরে যখন গরুর মত গন্ধ বেরোবে তখন বুঝবি"।

মিনি একটা ভেঙচি কেটে বলল "মোটেও না, আমি স্নান না করলে মোটেও গরুর মত গন্ধ বেরোয় না"।

কাকিমা বলল "সে নিজের গায়ের গন্ধ সবারই ভাল লাগে। তুই তো বলবিই। যা তো স্নান করতে, নইলে কিন্তু কিচ্ছু পাবি না আমি আগেই বলে দিলাম"। মিনি অলস পায়ে "ধুস ভাল্লাগে না" বলতে বলতে স্নানে ঢুকল। মিনিট পনেরোর মধ্যে স্নান সেরে জামাকাপড় চেঞ্জ করে চিরুনি দিয়ে জোরে জোরে চুল আঁচড়ে একটা ছোট্ট টিপ পরে খাবার ঘরে এসে দেখল ছেলেটা কেমন জড়োসড়ো হয়ে খেতে বসেছে।

মিনি একটা চেয়ার নিয়ে ছেলেটার সামনে বসে পড়ে বলল "আপনি কী যেন কাকে খুঁজছিলেন, পেলেন?"

বীরেন উদভ্রান্তভাবে মিনির দিকে তাকিয়ে বলল "না না, কিছুই খুঁজে পাই নি এখনও। দেখি জেঠামশায়ের কাছে পাই, যদি কিছু ব্যবস্থা হয়"। কাকিমা রান্নাঘরে দূর থেকে মিনিকে চোখ দিয়ে বকছিল। এভাবে অচেনা অজানা অপরিচিত কারও সামনে বসে পড়ার জন্য। মিনি সেটাকে আমল না দিয়ে বলল "জেঠু কি চেনে নাকি আপনি যাকে খুঁজছেন তাকে?" কাকিমা বলল "আহ, মিনি, তুই ওকে খেতে দিবি নাকি? পুলিশের মত জেরা শুরু করে দিয়েছিস! এই তুই এদিকে শোন তো!"

মিনি উঠে কাকিমার কাছে গেল। কাকিমা নিচু স্বরে বলল "কী হচ্ছে মিনি? তুই চিনিস ছেলেটাকে? এভাবে কথা বলছিস কেন?"

মিনি মুখ টিপে হেসে বলল "কেমন ক্যাবলাটাইপ লাগছে। চোখের দিকে পর্যন্ত তাকিয়ে কথা বলছে না"।

কাকিমা বলল "খুব পেকেছিস তুই। দিদি থাকলে আজ তোর কপালে দুঃখ ছিল"। মিনি বলল "দুঃখের দরকার নেই। তুমি আমার ব্রাঞ্চ দাও"।

কাকিমা অবাক গলায় বলল "ব্রাঞ্চটা কী বস্তু?"

মিনি বিরক্ত গলায় বলল "উফ কাকিমা তুমি না সেই এখনও আদ্যিকালের যুগেই পড়ে আছো। ব্রাঞ্চ মানে হল ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের সন্ধি। তুমি শোন নি আগে?"

কাকিমা বলল "না, শুনি নি"।

কলিংবেল বেজে উঠল।

কাকিমা বলল "ওই দেখ, আবার কে এল। দেখ তো আবার"।

মিনি বাইরের ঘরে গিয়ে দরজা খুলল। পাড়ার মেসবাড়ির একটা ছেলে। আজকাল মাঝে মাঝেই জেঠুর কাছে আসে। কারও সঙ্গে কোন কথাও বলে না। সোজা দোতলায় চলে যায়।

মিনি দরজা খুলে ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে দরজাটা ছেড়ে দাঁড়াল। ছেলেটা মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে হেঁটে দোতলায় জেঠুর কাছে চলে গেল। মিনি দরজা বন্ধ করে আবার রান্নাঘরে এল।

কাকিমা ফিসফিস করে বলল "সেই ছেলেটা না?"

মিনি বলল "হু"।

কাকিমা বিরক্ত গলায় বলল "কী যে শুরু করেছে দাদা আজকাল, কিছুই বুঝতে পারি না। সোমত্ত উচিত বাড়িতে এতজন মহিলা আছে, একটা বাইরের লোককে এভাবে ঢোকানো ঠিক না"।

মিনি বলল "জেঠু তো আগেই চেয়েছিল আলাদা বাড়ি নিয়ে থাকবে। বাবা আর কাকাই তো বাধা দিয়েছিল"।

কাকিমা গালে হাত দিল "কী যে বলিস, তা আবার হয় নাকি? সবাই একসঙ্গে না থাকলে সেটা আবার পরিবার হয় নাকি?"

মিনি বলল "তাহলে আর এখন বিরক্তি প্রকাশ করে কী করবে কাকিমা?" কাকিমা বলল "আচ্ছা, অনেক কথা বলেছিস, এবার খেয়ে নে। ও ছেলের খাওয়া হয়ে গেছে। তুই বসে পড়"।

বীরেন তড়িঘড়ি খেয়ে নিয়েছিল।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে জ্যোতির্ময়ের ঘরে পৌঁছে দেখল একটা ছেলে এসে বসে আছে। তাকে দেখিয়ে জ্যোতির্ময় ছেলেটিকে বললেন "এই যে সেই..."। ছেলেটা চোখ তুলে বীরেনের দিকে তাকাল। বীরেনের অপ্রস্তুত লাগছিল। এ বাড়িতে আসার পর থেকে সব কিছুই তার অদ্ভুত লাগছে। সে হাসার চেষ্টা করল। মুখে হাসি এল না।

জ্যোতির্ময় বললেন "ওর নাম ইউসুফ। তুমি ওর সঙ্গে যাও। ওই তোমাকে দিল্লির ফ্লাইটে তুলে দেবে। আজ রাতের মধ্যে তুমি শ্রীনগরে পৌঁছে আমাকে ফোন করবে। মনে রেখো তোমার নাম এখন থেকে সায়ক বড়াল, তোমার আই কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড এয়ারপোর্টে ঢোকার আগেই ইউসুফ তোমায় দিয়ে দেবে"। বীরেন নিস্প্রাণ নিস্পলক চোখে জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

৭।

দিল্লিতে যখন ফ্লাইটটা নামল তখন রাত সাড়ে আটটা। এয়ারপোর্টে গিয়ে চেক আউট করে আবার চেক ইন করে শ্রীনগরের ফ্লাইট ধরতে হল। ফ্লাইটের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

লোকই কাশ্মীরের বাসিন্দা। দিল্লিতে নেমে বাড়িতে একবার ফোন করেছে সে। বাবাকে বলেছে হঠাৎ করে কলকাতায় এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে থেকে যেতে হয়েছে। দু তিন দিন লাগতে পারে। বাবা বেশি চিন্তা না করলেও মা করেছে। মার কাছে নানারকম জবাবদিহি করতে হয়েছে। শেষমেষ হসপিটালে আছে, ফোনে বেশি কথা বলা যাবে না বলে ফোনটা কেটেছে সে।

দিল্লি অবধি ফ্লাইটের একরকম মেজাজ ছিল। কাশ্মীরের ফ্লাইটে অনেক বেশি চেকিং হল। একটা ব্যাগে একগাদা জামা কাপড়, শীতবস্ত্র দিয়ে দিয়েছিল ইউসুফ। সিকিউরিটি চেকিং এর সময় বীরেনের বার বার মনে হচ্ছিল এই বুঝি কিছু না কিছু ধরা পড়ে। কিন্তু তেমন কিছুই হল না। তার ছবি দিয়ে কীভাবে সায়ক বড়ালের আধার কার্ড বানিয়ে ফেলা হল কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না সে। সেই একই ঠিকানা। বীরেনের চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যর ইস্পাত কঠিন গলা যখন তাকে বলছিল তার বাবা মা বোনের সমস্ত ডিটেলস তাদের কাছে আছে, তার কথা না শুনলে সে ধারণাও করতে পারবে না তাদের কী হাল হতে চলেছে তখন বীরেনের মনে হচ্ছিল শিরদাঁড়া দিয়ে বোধ হয় কেউ হিমশীতল বরফ ঢেলে দিয়েছে। ভদ্রলোকের চোখের মধ্যে এক অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি আছে। যখন কথা বলেন, তখন অন্যদিকে তাকানোর কথা স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ইউসুফ আবার অন্য ধরণের। মনে হচ্ছিল একটা রোবট। সে পাড়ারই একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটা ব্যাগ তাকে দিয়ে গড় গড় করে বলে গেল মীর্জা শেখ নামের একজন তার জন্য শ্রীনগর এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করে থাকবে। বীরেন বারবার ইউসুফকে জিজ্ঞেস করে গেছে কীভাবে সায়কের এটিএমের সঙ্গে তার এটিএম পিন মিলল, তাকেই কেন এই ঝামেলায় পড়তে হল, ইউসুফ কেবল ইস্পাত কঠিন মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছে সে কিছু জানে না।

দিল্লি থেকে রাত সাড়ে ন'টায় ফ্লাইটটা যখন টেক অফ করল তখন বীরেনের হঠাৎ মনে পড়ল, আর চব্বিশ ঘণ্টা আগেও সে ভাবতেও পারেনি পরের দিন তার সঙ্গে কী হতে চলেছে। সে দেখল তার পাশের কাশ্মীরি ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে বসে আছে, খানিক দূরে এক শিখ পরিবার উচ্চস্বরে কথা বলছে, কেউ কেউ প্লেনে উঠেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দিল্লি থেকে কাশ্মীর বেশিক্ষণ লাগবে না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। যতবার চোখ বুজছিল, ততবার শুধু মায়ের মুখটাই ভেসে উঠছিল বীরেনের কাছে। আর কি কোনদিন বাড়ি ফিরতে পারবে? পাড়ার মোড়ে পটলদার চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে পারবে?

একটার পর একটা জিগস পাজল কিছুতেই মেলাতে পারছিল না সে। তবে কি সায়ক বড়ালের মনিব্যাগটা পাওয়া আসলে কাকতালীয় ছিল না? ভাবতে পারল না বীরেন। চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

হাজার সিকিউরিটি চেক আপের পর শ্রীনগর এয়ারপোর্ট থেকে সে যখন বেরোল তখন তার মোবাইল চার্জের অভাবে সুইচ অফ হয়ে গেছে। এক কাশ্মীরি ভদ্রলোক গোটা গোটা ইংরেজি অক্ষরে "সায়ক বড়াল" লিখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে এগিয়ে যেতে শুধু বললেন "ফলো মি"।

ভদ্রলোক প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। গায়ের রং আপেলের মত। বীরেন সম্মোহিতের মত তার পিছন পিছন হাঁটিতে হাঁটিতে পার্কিং লটে পৌঁছল। গাড়িতে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসিয়ে গাড়ি যখন এয়ারপোর্ট চত্বর ছাড়ল ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় তাকে বললেন "পথে আসতে কোন অসুবিধে হয় নি তো?"

বীরেন চমকে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। বলল "আপনি বাংলা জানলেন কী করে?"

ভদ্রলোক হাসলেন "পনেরো বছর টানা কলকাতায় ছিলাম। তাছাড়া এত অবাক হবার কিছু নেই, অনেক কাশ্মীরীই আছে যারা আপনাদের মত অনেক কলকাতার লোকেদের থেকে ভাল বাংলা বলতে পারেন। তাদের রুজি রুটি রোজগারের মধ্যে বাঙালির বিরাট একটা কন্ট্রিবিউশন আছে"।

বীরেন বলল "আপনিই মীর্জা?"

ভদ্রলোক বললেন "ইয়েস। আমিই"।

বীরেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। সব দোকানপাট বন্ধ। দু পা যেতে না যেতেই রাস্তার মধ্যে আর্মির গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বীরেন বলল "আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

মীর্জা বললেন "বলুন"।

বীরেন বলল "আমি কি দেশ বিরোধী কোন কাজ করতে যাচ্ছি?"

মীর্জা এতক্ষণ হাসিখুশি ছিলেন। বীরেনের প্রশ্ন শুনে বললেন "আপনাকে বোধ হয় বলা হয়েছে কোন প্রশ্ন না করতে, তাই না?"

বীরেন চুপ করে গেল।

বাকি রাস্তাটা মীর্জা একটাও কথা বললেন না। একটা জায়গায় লোকাল পুলিশের গাড়ি তাদের দাঁড় করাল। মীর্জা তার আধার কার্ড দিয়ে অজানা কোন ভাষায় সন্দিগ্ধ লোকাল পুলিশকে বোঝাল সে এক পর্যটককে এয়ারপোর্ট থেকে পিক আপ করতে গেছিল। বীরেনের আইকার্ড চেক করে তাদের গাড়ি ছাড়ল পুলিশ। বীরেন একবার ভেবেছিল চ্যাঁচামেচি জুড়ে দেবে, পরক্ষণেই বাবা মার মুখটা মনে পড়ে গেছিল তার।

গাড়ির কাঁচ বন্ধ ছিল। মীর্জা হঠাৎ করে কাঁচ নামিয়ে দিলেন। প্রবল ঠান্ডা হাওয়া গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। বীরেনের ঠান্ডা লাগলেও সে কিছু বলল না। পাথরের মত গাড়ির ভেতর বসে রইল।

৮।

একটা মাটির দোতলা বাড়ি। সংকীর্ণ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে বীরেন দেখল একটা ছোট্ট ঘরে মেঝেতে বিছানা করা। তাকে একটা অন্য সিম কার্ড দেওয়া হয়েছে। তার প্রি পেড সিম ছিল। এখানে প্রিপেড কাজ করে না। বলা হয়েছে বাড়িতে ফোন করলে করতে পারে।

বাইরে প্রবল শীত। বীরেনকে একটা জ্যাকেট দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও ঠান্ডা লাগছিল। এ পাড়াটা যথেষ্ট ঘিঞ্জি, কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে কোন বাড়ি থেকেই কোন রকম শব্দ বাইরে আসছিল না।

ঘরের ভেতরটা অদ্ভুতভাবে গরম। বাড়িগুলো মাটির হলেও এমনভাবে তৈরী করা যে খুব একটা ঠান্ডা ভিতরে আসে না। মীর্জাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল তাকে কী করতে হবে কিন্তু মীর্জা কোন উত্তর দেয় নি। এবাড়িতে নিচের ঘরে একজন অত্যন্ত বয়স্কা কাশ্মীরি মহিলা ছিলেন। তিনি মীর্জাকে অজানা একটা ভাষায় কিছু বললেন। প্রত্যুত্তরে মীর্জাও কিছু বললেন।

মেঝেতে খানিকক্ষণ বসে থেকে বীরেন মোবাইলটা নাড়া চাড়া করছিল। ফেসবুক খুলে দেখল বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম আপডেট দিয়েছে। কেউ বৃষ্টির ছবি দিয়েছে, কেউ বা জন্মদিনে বন্ধুদের ট্রিট দিচ্ছে, ফলাও করে তার ছবি দিয়েছে, ফেসবুকটা বেশ খানিকক্ষণ তাকে অনেক কিছু ভুলিয়ে দিচ্ছিল। বাড়িতে আর ফোন করে নি সে। ফোন করলেই বাবা মার একগাদা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হবে। মিনিট পনেরো বাদে মীর্জা নীচ থেকে ডাকলেন "খেতে আসুন"। বীরেন প্রথমে ভেবেছিল বলে দেবে খাবে না, কিন্তু সেটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রবল খিদে পেয়ে গেল। আর কিছু না ভেবে সে নিচে নামল। বুড়ি মহিলাটি মেঝেতে যত্ন করে কার্পেট পেতে ভাত বেড়েছেন। ভাত আর কিছু একটার তরকারি। বীরেন মাথা নীচু করে খেতে শুরু করল।

মীর্জা বললেন "বুড়ির দুই ছেলে। বড়টা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল বাজার করতে। হঠাৎ করে কারফিউ লেগে গেছিল বুঝতে পারে নি, গুলি খেয়ে মরেছে"। বীরেন এক নিঃশ্বাসে খেয়ে যাচ্ছিল। মীর্জার কথা শুনে খাওয়া থামিয়ে বুড়ির দিকে তাকাল। বুড়ি অজানা ভাষায় তাকে কিছু বললেন। বীরেন মীর্জার দিকে তাকাল। মীর্জা বললেন "আর ভাত দেবেন কী না জিজ্ঞেস করছে"।

বীরেন সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল "আর ছোট ছেলে?"

মীর্জা বললেন "লস্কর ই তৈবার নাম শুনেছেন"?

বীরেন হাঁ করে মীর্জার দিকে তাকাল। মীর্জা বললেন "এখান থেকে পঞ্জাবের দূরত্ব বেশি নয়। সে রাজ্যে এক বাড়ির দুই ছেলের একজন কানাডা কিংবা আমেরিকায় থাকে, অপরজন হয়ত প্রবাস করে, কাশ্মীরে এক বাড়ির এক ছেলে গুলি খেয়ে মরে, কেউ বা কাশ্মীর স্বাধীন করবে কিংবা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে বলে ..."

মীর্জা চুপ করে গেলেন।

বীরেন আতঙ্কিত গলায় বলল "আমাকে এখানে কেন আনা হয়েছে একটু বলবেন?"

মীর্জা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন "আজকের রাতটা বিশ্রাম করুন। সকালে আমার সঙ্গে বেরোবেন"।

প্রবল শীতেও বীরেন ঘামছিল। এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময়েই সে দেখছিল প্রতিটা রাস্তার কোণায় কোণায় সেনা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। হাতে রাইফেল নিয়ে রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সেনা।

মীর্জা বললেন "খেয়ে নিন। খালি পেটে থাকবেন না"।

বীরেন বলল "কেন?"

মীর্জা বললেন "কাশ্মীরে এই অভ্যাসটা রাখবেন। উপকার হবে"।

বীরেন আবার খাওয়া শুরু করল। কিছুক্ষণ চুপচাপ খেল। তারপর বলল "কাল সকালে কোথায় নিয়ে যাবেন?"

মীর্জা বললেন "অনন্তনাগ"।

বীরেন বলল "সেখানে কী করতে হবে?"

মীর্জা বললেন "বিশেষ কিছু না। একটা খাম দেওয়া হবে। সেটা ফিরে গিয়ে যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে জমা দিয়ে দেবেন"।

বীরেন বলল "একটা খামের জন্য আমাকে কেন এত কিছু করে পাঠানো হল! যে কেউই তো নিয়ে যেতে পারত !"

মীর্জা বীরেনের কথার উত্তর দিলেন না।

বীরেনের খাওয়া হয়ে গেছিল। একটা পাত্রের মধ্যেই বুড়ি তার হাত ধুইয়ে দিল। মীর্জা বললেন "আমি নিচে আছি। আপনি মোবাইলে ফুল চার্জ দিয়ে রাখুন"।

বীরেন কয়েক সেকেন্ড মীর্জার দিকে তাকিয়ে বলল "একটা কথা জানতে পারি?"

মীর্জা বললেন "বলুন"।

বীরেন বলল "আপনারা টেররিস্ট না সিবি আই? পার্সেলে বোম থাকবে না তো? সিনেমায় যেমন দেখায়। এমন জিনিস হয়ত দিয়ে দিলেন প্লেনেই ফেটে গেল জিনিসটা!"

মীর্জা বীরেনের প্রশ্ন শোনা মাত্রই জোরে জোরে হেসে উঠলেন। বেশ কয়েক সেকেন্ড

ধরে হেসে বললেন "আপনার একজন গার্ল ফ্রেন্ড আছে না?"
বীরেন অবাক হয়ে মীর্জার দিকে তাকাল।
মীর্জা হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।
বীরেন গম্ভীর হল "না, অরিত্রি আমার গার্লফ্রেন্ড না। ওর বিয়ে হয়ে যাবে"।
মীর্জা বললেন "স্যাড"।
বীরেন বলল "স্যাডের কিছু নেই। প্রথমে আমিও গার্লফ্রেন্ডই ভেবেছিলাম। তারপর দেখা গেল কখন যেন চাকর বানিয়ে দিয়েছে। যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে, তার সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাবে। ফ্রেন্ড জোনড লেভেল ইনফিনিটি"।
মীর্জা একটা সিগারেট ধরালেন। কয়েকটা টান দিয়ে বললেন "মেয়েরা"।

৯।

মিনি ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিল। মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হলে কিচ্ছু ভাল লাগে না। সব সময় এ ব্যথা আসে না, যখন আসে তখন পাগল করে দেয়। ছটফট করতে করতে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।
অন্যান্য দিন এই সময় মিনি পড়তে বসে। বিকেলে হঠাৎ করেই মাথা ব্যথা শুরু হয়েছিল। তার পর থেকে কমার কোন লক্ষণ নেই। আগে হলে সে গোটা গোটা স্যারিডন খেয়ে নিত। ডাক্তার আন্টি জানার পর থেকে খুব বকাবকি করেছেন।
বলেছেন মাইগ্রেনের আলাদা ওষুধ আছে। এত বেশি স্যারিডন খাওয়া ভাল না। মিনি দেখেছে স্যারিডনের সঙ্গে তার একটা আত্মিক যোগ তৈরী হয়েছে। যত ওষুধই খাওয়া হোক, স্যারিডন না খেলে মাথা ব্যথা কমে না। যে কটা স্যারিডন ছিল মা সব লুকিয়ে রেখেছে। হয়ত ফেলেই দিয়েছে। অনেক খোঁজা খুজি করেও না পেয়ে মিনি হাল ছেড়ে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে শুয়েছে। সমস্যা হল সকালে ভাবছিল মা নেই সে স্বাধীন, যা ইচ্ছা করতে পারে। এখন মনে হচ্ছিল মা থাকলেই ভাল হত। প্রতিবারের মত অন্তত মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেও ব্যথা খানিকটা কমত।
দরজায় কেউ একজন নক করল।
মিনি গলা তুলল "কে?"
কাকিমা বলল "দরজা খোল"।
মিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দরজা খুলল।
কাকিমা বলল "কী হয়েছে? আবার মাথা ধরেছে?"
মিনি বলল "হ্যাঁ। বাবা কাকা ফিরেছে?"
কাকিমা বলল "না, পাড়ার ক্লাবে কী একটা মিটিং আছে, অফিস ফেরতা সে মিটিং করে ফিরবে"।
মিনি বলল "পুজোর মিটিং?"

কাকিমা বলল "হবে হয়ত। শুনছিলাম তো এবারের থিম বিশ্বকাপ ফুটবল"।
মিনি হাসল "কত ক্লাবে একই থিম হবে এবার দেখবে"।
কাকিমা বলল "যা বলেছিস। সব তো একই দিকে যাবে"।
মিনি বলল "জেঠু মিছিলে যায় নি নিশ্চয়ই"?
কাকিমা বলল "খেপেছিস? বড়দা যাবে মিছিলে? তবেই হয়েছে"।
মিনি বলল "বেরিয়েছে, না ঘরেই আছে?"
কাকিমা বলল "ঘরেই আছে। কেন রে?"
মিনি বলল "সেই যে লোকটা এসেছিল, দুপুরে খেল, কোথায় গেল কে জানে।
কেমন একটা ক্যাবাক্যাকা মার্কা চেহারা তাই না?"
কাকিমা বলল "হ্যাঁ। কেমন করে খেল দেখলি তো? কেমন কেমন যেন"!
মিনি বলল "বাদ দাও। তোমার কাছে স্যারিডন আছে?"
কাকিমা চোখ বড় করল "একদম না। দিদি জানতে পারলে কী হবে বুঝতে পারছিস?"
মিনি রেগে গেল। বড় বড় পা ফেলে সিঁড়িতে উঠল, কাকিমা পেছন থেকে ডাকছিল সে কানেও দিল না। দোতলায় উঠে জেঠুর ঘরে নক করল "জেঠু আছো?"
জ্যোতির্ময় ঘরেই ছিলেন। বললেন "আয়"।
মিনি ঘরের ভেতরে ঢুকল। জ্যোতির্ময় টিভি দেখছিলেন। মিনি বলল "স্যারিডন আছে?"
জ্যোতির্ময় ভ্রু কুঁচকালেন "আবার ধরেছে?"
মিনি বলল "হ্যাঁ। মা সব লুকিয়ে রেখে গেছে"।
জ্যোতির্ময় বললেন "দেখ আমার ওষুধের বাক্সে পাস নাকি"।
মিনি আর দেরী করল না। টেবিলের ওপরেই জ্যোতির্ময়ের ওষুধের বাক্স। সেটা তড়িঘড়ি খুঁজতে শুরু করল। পেয়েও গেল। একটা স্যারিডন জল দিয়ে গিলে বলল "উফ, ভাগ্যিস তোমার কাছে ছিল! বাঁচালে"।
ওষুধের বাক্সটা নিতে গিয়ে একটা লিফলেট মাটিতে পড়ে গেছিল। মিনি সেটাকে তুলতে গিয়ে দেখল আরবী ভাষায় কী সব লেখা আছে। সে অবাক হয়ে জেঠুর দিকে তাকাল "এটা কী জেঠু?"
জ্যোতির্ময় টিভি দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে বললেন "হবে কিছু একটা।
কাগজের মধ্যে ছিল"।
মিনি বলল "এটা কী লেখা?"
জ্যোতির্ময় কাঁধ নাচালেন "কে জানে"।
মিনি কাগজটা ওষুধের বাক্সের নিচে রেখে দিল। জ্যোতির্ময় বললেন "তোর বাবা এলে একবার পাঠাস তো এই ঘরে। কথা আছে কিছু"।

মিনি বলল “আচ্ছা”।

জ্যোতির্ময় বললেন “স্মারিজুন আমার ঘরে পেয়েছিস...”

মিনি জ্যোতির্ময়কে থামিয়ে দিয়ে বলল “জানি জানি, কাউকে বলব না”। জ্যোতির্ময় হাসলেন। ফোনটা বাজছিল। জ্যোতির্ময় বললেন “ফোনটা দে তো”। মিনি ফোনটা দিয়ে ঘর থেকে বেরোল। পরক্ষণেই সিঁড়ি দিয়ে নামার পরিবর্তে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সম্পূর্ণ অজানা ভাষায় জেঠু গড়গড়িয়ে কারও সঙ্গে কথা বলছে।

মিনি কিছুই বুঝল না, তার শুধু একটা কথাই মনে হল, জেঠু ঠিক কটা ভাষা জানে?

১০।

ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে তুলে দিয়েছেন মীর্জা। এমনিতেই সারা রাত এপাশ ওপাশ করেছিল বীরেন। শেষ রাতের দিকে ঘুম এসেছিল। মীর্জা ডাকলেন যখন বীরেন প্রথমে ভেবেছিল বাড়িতেই আছে সে। বাবা হয়ত ডাকছে। দ্বিতীয়বার ডাকার পরে হুশ ফিরল তার। ধড়মড় করে উঠে বসল।

মীর্জা বললেন “নিচে টয়লেট আছে। কাম কাজ সেরে তৈরী হয়ে নিন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে”।

বীরেন অনিচ্ছুক শরীরে উঠল। বাইরে বেশি শীত না থাকলেও শালের প্রয়োজন পড়ছিল। অন্ধকার বাইরেটা। তৈরী হয়ে গাড়িতে যখন উঠল তখন পৌনে ছটা বাজে। নিচের ঘরে বুড়ি শুয়েছিল। ডাকবে ভেবেও ডাকল না। হঠাৎ করে কেন জানে না, মায়ের কথা মনে পড়ল তার। একটু মন খারাপ হল।

মীর্জা ড্রাইভারের সিটে তৈরী হয়েই বসে ছিলেন। তাকে বসতে দেখে গাড়ি স্টার্ট করে বললেন “আধার হাতের কাছে রাখুন। রাস্তায় চেকিং হবে। নাম কী আপনার?”

বীরেন মৃদু গলায় বলল “সায়ক বড়াল”।

মীর্জা খুশি হলেন “গুড”।

বৃষ্টি পড়ছিল ঝিরি ঝিরি। এখনও অন্ধকার চারদিক।

মীর্জা বললেন “কাশ্মীর কাদের দেশ?”

বীরেন বলল “ভারতের”।

মীর্জা বললেন “কাশ্মীরিরা কাদের?”

বীরেন বলল “নিশ্চয়ই এদেশের”।

মীর্জা বললেন “তার মানে ভারতের? তাই তো?”

বীরেন বলল “হ্যাঁ”।

মীর্জা বললেন “নিজের দেশের লোকেদের কেউ কুকুরের মত মারে? আপনার কী মনে হয়?”

বীরেন বুঝল মীর্জা উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। সে কিছুটা সংকুচিত হয়ে বলল "আমার এই ব্যাপারে তেমন কোন ধারণা নেই"।

মীর্জা বললেন "সেটা স্বাভাবিক। আম ভারতীয় সেসব নিয়ে চিন্তা করবে না সেটাই তো স্বাভাবিক। আমাদের আগুনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছেন"।

বীরেন কিছু বলল না। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে এসব উত্তেজিত কথা বার্তা সে ঠিক নিতে পারছিল না। বাইরেটা যেন যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে আছে। খানিক দূর পর পর সেনা ছাউনি, সেনা টহল দিচ্ছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। শ্রীনগর ছাড়িয়ে বেরোতে বেশিক্ষণ লাগল না। রাস্তা ফাঁকাই ছিল।

মীর্জা বললেন "কোথায় যাচ্ছি জানেন?"

বীরেন বলল "না। আমি কেন এতদূর এসেছি সে সম্পর্কেও আমার কোন ধারণা নেই"।

মীর্জা কিছু বললেন না।

বীরেন বলল "অ্যাকচুয়ালি আমি একেবারেই অন্ধকারে আছি। কাল সকালে এই সময়েও আমি ঘুমাচ্ছিলাম নিজের বিছানায়, আমার কোন ধারণাই ছিল না আমার সঙ্গে আগামী চব্বিশ ঘন্টায় কী হতে চলেছে..."

মীর্জা বীরেনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন "এক্জ্যাক্টলি আপনার মত মানসিক অবস্থাই আম কাশ্মীরীদের জানেন তো? তারাও জানে না আগামী চব্বিশ... না না চব্বিশ কেন, আগামী এক ঘন্টায় তাদের সঙ্গে ঠিক কী হতে চলেছে। একদিকে আছে আপনাদের দেশের সেনাবাহিনী, অপরদিকে ওদেশের, যে ছেলেটা বাড়ি থেকে বেরোল সকালবেলা, দুপুরে দেখা গেল আর্মির গুলি খেয়ে কোন রাস্তায় কুকুরের মত পড়ে আছে"।

বীরেন মরিয়া হল খানিকটা "এসব কথা আমাকে বলছেন কেন মীর্জা সাহেব?"

মীর্জা বললেন "বিরক্ত লাগছে?"

বীরেন বলল "ঠিক তা নয়, কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না আমি ঠিক কোন মেন্টাল স্টেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি... বাড়িতে জানে না আমি কোথায়, ইনফ্যাক্ট আমি নিজেও জানি না আমাকে ঠিক কী করতে হবে..."

মীর্জা বললেন "আপনাকে তো বলেছি আপনাকে শুধু একটা খাম নিয়ে যেতে হবে। আজ অনন্তনাগ যাব। বিকেলের মধ্যেই আপনাকে শ্রীনগর পৌঁছে দেব আমি"।

বীরেন বলল "অনন্তনাগে কোথায়? মানে ঠিক কোথায় যেতে হবে?"

মীর্জা বললেন "গেলেই দেখতে পাবেন"।

বীরেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

মীর্জা বললেন "কাল রাতে খুব হালকা একটা আর্থ কোয়েক হয়েছে। টের পেয়েছিলেন?"
বীরেন মাথা নাড়ল "না"।
মীর্জা বললেন "স্বাভাবিক। টায়ার্ড ছিলেন। আমিও বুঝিনি। সকালে একজন জানাল"।
বীরেন বলল "কে?"
মীর্জা বললেন "চিনবেন না। খিদে পেয়েছে?"
বীরেন মাথা নাড়ল "না। এখন কিছু খাব না"।
গাড়ি কিছুটা যাবার পর রাস্তায় একদল পুলিশ দাঁড় করাল। মীর্জা গাড়ি দাঁড় করাতে করাতে ফিসফিস করে বলল "সায়কবাবু কিছু বলবেন না"। আর্মি নয়। জম্মু কাশ্মীরের পুলিশ। গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্রথমে গাড়ির কাগজপত্র চেক করল। তারপর তার আধার কার্ড চেক করল। বেশ খানিকক্ষণ পরে গাড়িটা আবার যাত্রা শুরু করল।
মীর্জা বললেন "এক নম্বরের জানোয়ারের বাচ্চা এই পুলিশগুলো। টাকা খাওয়া ছাড়া আর কিছু জানে না"।
আলো ফুটেছে চারপাশের। কাল রাতে এয়ারপোর্টে নেমে কাশ্মীরের কিছুই দেখতে পায় নি বীরেন। এখন ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার চারপাশ দেখে মুগ্ধ হতে শুরু করল বীরেন। কী অপূর্ব চারপাশ! ভূ স্বর্গ কি সাধে বলে?

১১।

অনন্তনাগ পৌঁছতে পৌঁছতে সকাল ন'টা হয়ে গেল। শহর থেকে বেরিয়ে একটা গ্রামে পৌঁছল তাদের গাড়ি। একটা বড় বাড়ি। বিরাট গেট। মীর্জার গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার হর্ন দিলে গেটটা খুলে গেল। গেট খুলতে দেখা গেল অনেকটা জায়গা নিয়ে বারান্দা। সুদৃশ্য বাগান।
মীর্জা বললেন "কাল আপনাকে কষ্ট করতে হয়েছে। আজ ভাল খাওয়া পাবেন"।
বীরেন কিছু বলল না।
গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নেমে মীর্জা বীরেনের দরজা খুলে দিল। বীরেন নামল।
এক ভদ্রমহিলা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন বাড়ির ভেতর থেকে, মীর্জাকে কিছু বললেন। মীর্জা জানিয়েছিলেন এটা পুস্তু ভাষা। তারা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল। বীরেনকে বসার ঘরে বসিয়ে মীর্জা বাড়ির ভেতরে গেলেন।
বীরেন অবাক হয়ে বাড়ির আসবাবপত্র দেখছিল। কাঠের এমন সূক্ষ্ম কাজ আগে সে দেখেনি। যে কার্পেটটা পাতা আছে মেঝেতে, সেরকম কার্পেটও সে আগে দেখেনি।

ভদ্রমহিলা খানিকক্ষণ পরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলেন। কাওয়া চা, বাখরখানি, আর এক বড় জামবাটিতে মাংস। মীর্জা এসে বসলেন তার পাশে "খেয়ে নিন, গরু না। ভেড়া। ইট উইল নট হার্ট ইওর রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট"।

বীরেনের সত্যিই খিদে পেয়েছিল। সে খাওয়া শুরু করল। খেতে খেতে আলো চলে গেল।

মীর্জা বললেন "লোডশেডিং। কাশ্মীরের রেগুলার ইনসিডেন্ট"।

ভদ্রমহিলার রান্না অপূর্ব। বীরেনের খাওয়া শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগল না। মীর্জা বললেন "ওই ঘরে ঢুকে ডানদিকে বেসিন আছে। মুখ ধুয়ে পাশের ঘরে চলে যান। ওখানেই আপনার সামান রাখা আছে। রেস্ট নিয়ে নিন। আমি ডেকে নেব"।

বীরেন বিনা বাক্যব্যয়ে মীর্জার নির্দেশ পালন করল। মুখ হাত ধুয়ে মীর্জার দেখানো ঘরে প্রবেশ করল।

ছোট্ট ঘর কিন্তু অত্যন্ত সাজানো গোছানো। সুদৃশ্য কাঠের আসবাব বসার ঘরের মতই। কাশ্মীরীদের রুচি সম্পর্কে সে শুনেছিল, সিনেমায় দেখেছিল কিন্তু এই বাড়িতে আসার পরে সে বুঝতে পারছিল এরা কতটা সৌন্দর্যপ্রিয়। খাটে শুতেই খানিকটা পথশ্রমে, খানিকটা গতরাতের কম ঘুমের জন্য তার একবারে ঘুম চলে এল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল খেয়াল ছিল না, ঘুম ভাঙল দরজা ধাক্কার শব্দে। সে ঘুম চোখে উঠে দরজা খুলল। মীর্জা বিরক্ত গলায় বললেন "দরজা বন্ধ করার কী ছিল? ফোন ধরুন, স্যার কথা বলবেন"।

বীরেন দেখল মীর্জা তার দিকে ফোনটা এগিয়ে দিয়েছেন। সে ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে জ্যোতির্ময়ের গলা ভেসে এল "ঘুম হয়েছে?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ"।

জ্যোতির্ময় বললেন "তৈরী হয়ে নাও। এখান থেকে মীর্জা তোমাকে শ্রীনগর এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। দিল্লি পৌঁছে আমাকে ফোন করবে"।

বীরেন বলল "দিল্লি থেকে কোলকাতা ফিরব তো?"

জ্যোতির্ময় বললেন "দেখছি, দিল্লি পৌঁছে ফোন করলে বলব"।

বীরেন বিরক্ত গলায় বলল "এসব কী তামাশা চলছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার বাড়িতে চিন্তা করবে তো"।

জ্যোতির্ময় শান্ত গলায় বললেন "তোমার বাড়িতে জানাও চাকরির একটা আর্জেন্ট ইন্টারভিউর জন্য তোমাকে দিল্লি যেতে হচ্ছে। কেউ চিন্তা করবে না"।

বীরেন কিছু বলতে যাচ্ছিল ফোনটা কেটে গেল।

সে অবাক চোখে মীর্জার দিকে তাকাল। মীর্জা বললেন "দশ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নিন। আর সময় দেওয়া যাবে না। অনেক ঘুমিয়েছেন।"

মীর্জার গলায় একটা কড়া ভাব ছিল যেটা এতক্ষণ ছিল না। বীরেন বাথরুমে ঢুকে গরম জলে স্নান সেরে নিল। তৈরী হয়ে তারা যখন বেরোল তখন দুপুর দুটো বাজে।
মীর্জা বললেন "আপনার ক্যাপ চেঞ্জ করে দেওয়া হবে শ্রীনগরে। ড্রেসও। আর কোন শীতের জায়গায় মনে হয় না আপনাকে যেতে হবে"।
বীরেন কিছু বলল না। তার রাগ হচ্ছিল। এতক্ষণ সে বাবা মা, বোনের কথা ভেবে নিঃশব্দে জ্যোতির্ময় যা বলছিলেন সব পালন করে যাচ্ছিল, এখন তার ভেতরের বিপ্লবী সত্তাটা ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল।
সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।
মীর্জা বললেন "অনন্তনাগে গত তিন দিন ধরে কারফিউ চলছে। কোন কোন জায়গায় ঝামেলা চললেই শুট অ্যাট সাইটের অর্ডার আছে"।
বীরেন বলল "আপনার গাড়িকে কোন ঝামেলা ছাড়াই এভাবে গোটা কাশ্মীর ঘুরতে দিচ্ছে কেন?"
মীর্জা শব্দ করে হাসলেন। বীরেনের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না।

১২।

মিনি ঘুমাচ্ছিল। কাকিমা ঘুম থেকে তুলল সকাল আটটায়।
মিনি বিরক্ত গলায় বলল "কী হয়েছে"?
কাকিমা বলল "কলেজ যাবি না আজ? তোর মা ফোন করেছিল সকালে। বলল তোকে ঘুম থেকে তুলে দিতে"।
মিনি ঘুমন্ত চোখে খানিকক্ষণ কাকিমার দিকে তাকিয়ে বলল "ঢপ মারতেও জানো না"।
কাকিমা বলল "হ্যাঁ, আমি ঢপ মারব আর তোর মা এসে আমাকে ঝাড়ুক"।
মিনি বলল "বাবা কোথায়?"
কাকিমা বলল "বাজারে গেছে"।
মিনি বলল "কাকু নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেছে"।
কাকিমা বলল "হ্যাঁ। তুই এবার ঘুম থেকে ওঠ। অনেক হয়েছে"।
মিনি আড়মোড়া ভাঙল। কাকিমা জানলা খুলে বলল "ঈশ, সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে"।
মিনি চোখ পিটপিট করে বাইরের দিকে তাকিয়ে আবার শুয়ে পড়ল "আমি এই বৃষ্টিতে কোথাও যাচ্ছি না। মেরে ফেললেও যাব না"।
কাকিমা খাটে বসে পড়ে বলল "তাহলে তোর মাকে ফোন করে বলে দিস। আমি এত দায়িত্ব নিতে পারলাম না"।

মিনি কাকিমাকে জড়িয়ে ধরল "প্লিজ প্লিজ কাকিমা, আজকের দিনটা ম্যানেজ দাও। তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব"।

কাকিমা বলল "হ্যাঁ, অনেক গোলাম হয়েছিস। আর গোলাম হয়ে কাজ নেই। বিশুর মা আসার আগে বিছানা ছাড়। বাসী বিছানা রাখিস না"।

মিনি বলল "বিশুর মা আসুক। তারপরে দেখছি। তবে আজ আমি কলেজ যাচ্ছি না এটা শিওর"।

কাকিমা বলল "কী করবি সারাদিন?"

মিনি বলল "কী আবার করব? ঘুমাব? ওটাই তো ভাল পারি"।

কাকিমা বলল "ওদিকে দাদার পাগলামিটা আবার বেড়েছে"।

মিনি চোখ বড় বড় করল "জেঠুর?"

কাকিমা বলল "হ্যাঁ। সকালে দেখছি আজান শুনছিল মোবাইলে। বলে আরবী ভাষায় কী সব পড়াশুনা করার জন্য ওটা দরকার"।

মিনি হাসতে হাসতে বলল "কনভার্ট হয়ে গেল নাকি জেঠু? তাহলেই হয়েছে? ভটচাজ বাড়ির বড় ছেলে দাড়ি রাখিয়ে লুঙ্গি পরে ঘোরাফেরা করবে"।

কাকিমাও হাসল, বলল "ওভাবে জেনারালাইজেশন করাটা কি ঠিক? সব মুসলমানই কিন্তু ওরকম দাড়ি রাখেন না, লুঙ্গিও পরেন না। তবে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হঠাৎ করে ধর্ম নিয়ে পড়লে একটু কেমন কেমন লাগে। আমি দেখেছি সাধারণত যারা প্রথম দিকে নাস্তিক হয়, তারাই চট করে কেমন ব্রেইন ওয়াশড হয়ে যায়"।

মিনি হাই তুলল "হ্যাঁ কথাতেই আছে নতুন মুসলমান গরু খাবার যম হয়"।

কাকিমা বলল "গরু খেলে কি না খেলে জাত ধর্ম ঠিক হয় বলে আমি মনে করি না। তুই কি মনে করিস শুয়োর বা গরুতে জাত যায়?"

মিনি বলল "আমার তো এসব জিনিস কোনকালেই ভাল লাগে না তুমি জানোই। যে জিনিস দাঙ্গার কারণ হয়, মানুষের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়, সে জিনিস একেবারেই আমি পছন্দ করি না"।

কাকিমা বলল "একজ্যাক্টলি। দ্যাখ তো, সকাল সকাল আমরা দুজনে কেমন গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু করে দিলাম"।

মিনি একটু চিন্তিতভাবে বলল "কথাটা উঠল বলে আমারও একটু একটু মনে হচ্ছে জানো তো, কাল দেখলাম জেঠুর ঘরে একটা আরবী ভাষার লিফলেট টাইপ। কী লেখা ছিল পড়ি নি। বাবাকে বলব এ ব্যাপারে কিছু?"

কাকিমা মাথা নাড়ল "ধুস, অত সিরিয়াস কিছু না। প্রতিভাবান মানুষদের এরকম পাগলামি আসে। সেরেও যায়। ঘরে বসে দেখছিস না সারাক্ষণ শেয়ার বাজারে বেচা কেনা করে যাচ্ছে। দেখলে কে বলবে এই লোকটাই এককালে আই আই টিতে প্রথম দিকে র‍্যাঙ্ক করেছিল?"

মিনি বলল "সেটাই তো চিন্তার। কী যে করছে জেঠু। আচ্ছা ধরে বেঁধে একটা বিয়ে দিয়ে দিলে হয় না?"
কাকিমা শব্দ করে হেসে উঠল "কী যা তা বলছিস?"
মিনি বলল "হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। তাহলে আর্টিস্ট আমাকে এসব নিয়ে ভাবতে হত না। আচ্ছা, আজ একটা কাজ করি চল"।
কাকিমা উৎসুক হল "কী?"
মিনি বলল "জেঠু তো এগারোটা নাগাদ বেরোয় প্রায় রোজই। আজ বেরোলে চল আমরা জেঠুর ঘরে হানা দি"।
কাকিমা গালে হাত দিল "সে আবার কী? জানতে পারলে তো তুলকালাম হবে"!
মিনি বলল "আরে চলই না। কী আর হবে? আর্টিস্ট পাগলামিটা কোন লেভেলে আছে খানিকটা আঁচ পাওয়া যাবে।"
কাকিমা ঠোঁট কামড়ে বলল "কিন্তু..."
মিনি কাকিমাকে চুপ করিয়ে দিল "কোন কিন্তু না। জেঠু বেরোলে আমরা তদন্ত শুরু করছি, ব্যস। অপারেশন জেঠু। হি হি"। কাকিমা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল "কত রকমের যে পাগল হয় তোকে না দেখলে জানতেই পারতাম না"।

১৩।

শ্রীনগর এয়ারপোর্টের গেটের সামান্য আগে মীর্জা গাড়ি থামিয়ে বললেন "গাড়ির ডিকিতে ব্যাগটা রাখা আছে। পুরনো ব্যাগটা গাড়িতেই থাকুক। নতুন ব্যাগটা নিয়ে সিকিউরিটি চেক আগে নেমে যাবেন। এখানে সমস্ত কিছু ম্যানুয়াল প্রসেসে হয়। প্লেনে ওঠার আগেও নিজের ব্যাগ আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে। ভাল করে ব্যাগটা বুঝে নেবেন। মনের মধ্যে নিজের নামটা যে সায়ক বড়াল সেটা বারবার বলতে থাকুন। শ্রীনগর এয়ারপোর্ট কিন্তু দেশের আর পাঁচটা এয়ারপোর্টের মত নয়। মনে করুন আপাতত ভারত অধিকৃত পাকিস্তানে আছেন। এখানে প্রচুর চেকিং হতে পারে যদি ওদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়। "
বীরেন ভাবলেশহীন মুখে বলল "ঠিক আছে"।
মীর্জা গাড়ি স্টার্ট করে এয়ারপোর্টের ভেতর গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চললেন। গেটের মুখে গাড়ি দাঁড় করানো হল। বীরেনের টিকিট দেখে তবেই গাড়ি ছাড়ল নিরাপত্তারক্ষীরা।
মীর্জা সিকিউরিটি কাউন্টারের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললেন "এখানেই নেমে যান। আর কোন দিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে নাকি জানি না। ভাল থাকবেন"।
বীরেন মীর্জাকে কিছু বলল না। সে গাড়ি থেকে নামল। মীর্জা কিছু একটা সন্দেহ

করে গাড়ি থেকে নেমে ডিকিটা খুলে বীরেনকে ফিসফিস করে বললেন "কোন রকম চালাকি করবেন না। এখানে যদি পুলিশকে আপনার আসল নামও বলেন, মনে রাখবেন সে ক্ষেত্রেও আপনার জেলই হবে। আশা করছি আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান, আমাকে বেশি এক্সপ্লেইন করতে হবে না। আর হ্যাঁ, প্লেনে উঠেই সোয়েটার খুলে দেবেন। দিল্লিতে সোয়েটার পরে থাকলে আর দেখতে হবে না"। বীরেন কিছু না বলে ব্যাগটা নিয়ে সিকিউরিটি কাউন্টারের দিকে এগোল। মীর্জা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সিকিউরিটি চেকিং করে বোর্ডিং পাশ নিয়ে দ্বিতীয়বার সিকিউরিটি চেকিং এর জন্য অন্য একটা কাউন্টারে যেতে বলল। প্লেনে যখন উঠল তখন বিকেল সাড়ে চারটে পেরিয়েছে। প্লেনের প্রায় সবাই কাশ্মীরেরই লোক। এই সময় কেউ কাশ্মীরে বেড়াতে আসে না বোঝাই যায়। বীরেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। তার মাথায় অনেক কিছু ঘুরছিল। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না তার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। বাবা মা বা বোনের ভয় দেখিয়ে লোকটা ঠিক কী করিয়ে নিচ্ছে তাকে দিয়ে সে সম্পর্কে বীরেন কোন ক্লু পাচ্ছিল না।

কাশ্মীরে সে এর আগে আসে নি। মীর্জার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল সে হয়ত ভারতে নেই। কোন কোন জায়গায় দেওয়াল লিখে রেখেছে "গো টু হেল ইন্ডিয়া" কিংবা "উই নিড ইন্ডিপেন্ডেন্স", কোথাও কোথাও "পকিস্তান জিন্দাবাদ"ও লেখা। মীর্জার কথা মনে পড়ল তার, এই ভূখন্ডের লোকেদের নিয়ে দিনের পর দিন যেভাবে রাজনীতি চলছে, একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়েকেও সেনারা যেভাবে তল্লাশি করছে, প্রতিটি কাশ্মীরির বাড়িতে যেভাবে সেনারা অতর্কিতে রাত বিরেতে হানা দিচ্ছে, মেয়েদের লাজ লজ্জা বলে কিছু রাখছে না, তাতে এখন অধিকাংশ কাশ্মীরিই এই দেশে আর থাকতে চাইছে না। অপরদিকে যারা ভেবেছিল পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ভাল, তাদের সে ভুল ধারণাও দিনে দিনে ভাঙছে। ব্যাপারটা অনেকটাই নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস টাইপ ব্যাপার হয়ে গেছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরটা জঙ্গীদের ডেরা হয়ে গেছে। সমস্ত বড় বড় জঙ্গিদের পাকিস্তান সরকার প্রত্যক্ষ মদত দিচ্ছে। কাশ্মীরেও কম বয়সী যুবকদের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত টাকা দিয়ে উস্কানো হচ্ছে ধর্মের নামে। দুপাশের সেনার দাপটে সাধারনভাবে বেঁচে থাকতে চাওয়া মানুষগুলোর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

এত সব কিছুর মধ্যে হঠাৎ বীরেনের হুশ ফিরল জানলার বাইরে দেখে।

হিমালয়ের এমন অপূর্ব রূপ! সে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। তাদের বিমান যখন শ্রীনগর ছেড়েছিল তখনও যথেষ্ট মেঘ ছিল আকাশে। এখন একেবারেই মেঘ নেই। "তুষারশুভ্র" হিমালয় এত সুন্দর? সব কিছু ভুলে যাচ্ছিল বীরেন ধীরে ধীরে। জ্ঞান ফিরল পাশের যাত্রীর কথায়, "আপ কাহাসে হো"?

বীরেন এতক্ষণ নিজের মধ্যে ছিল না। মীর্জার কথা মনে পড়ল। কারও সঙ্গে বেশি কথা নয়। সে বাঙলাতেই বলল "আমি অন্য ভাষা জানি না"। পাশের বয়স্ক কাশ্মীরী ভদ্রলোক কী বুঝলেন কে জানে, চুপ করে গেলেন। বীরেন ঘোরের মধ্যে ছিল। প্লেনের অনেককেই সোয়েটার/জ্যাকেট খুলতে দেখে নিজের সোয়েটার খুলে ফেলল।

মিনিট পনেরো চোখ বন্ধ করে বসে রইল। ঘোষণা হচ্ছে প্লেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি পৌঁছবে। বীরেন ঘড়ি দেখল। ছ'টা দশ পনেরোর মধ্যে দিল্লি পৌঁছে ফোন অন করার নির্দেশ আছে। তার চোয়াল শক্ত হল। সে ঠিক করল ফোন অন করবে না। দিল্লি গিয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে স্টেশনে পৌঁছে যে কোন ট্রেনে উঠে বাড়ির দিকে রওনা দেবে। পাড়ায় পৌঁছে দেখা যাবে যা হবার হবে। প্লেন খানিকক্ষণ পরেই দিল্লির মাটি ছুঁল।

বীরেন গম্ভীর মুখে প্লেন থেকে নেমে কোন দিকে না তাকিয়ে ব্যাগের জন্য ছুটল। কনভেয়ার বেল্টে ব্যাগ এসে গেছিল মিনিট দশেকের মধ্যেই। সে ব্যাগ নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোতেই যাচ্ছিল এমন সময় দেখল টিভির সামনে বেশ কয়েকজন লোক উত্তেজিত স্বরে কথা বার্তা বলছে।

কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখল টিভিতে ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে শ্রীনগর এয়ারপোর্টের বাইরের আর্মি ক্যাম্পে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে চারজন জওয়ান মৃত। সে হাঁ করে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল।

১৪।

। ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো অফিস, নতুন দিল্লি, ব্লক আটটা।।

মাথুর গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। খান ঘরে ঢুকেই মাথুরকে বললেন "ক্যাজুয়ালটি আর বেড়েছে?"

মাথুর মাথা নাড়লেন।

খান বললেন "কে ছিল বলে তোমার মনে হয়?"

মাথুর বললেন "মীর্জার গাড়ি ছিল"।

খান চমকে মাথুরের দিকে তাকালেন। মাথুর বললেন "মীর্জা ছিল?"

মাথুর খানের চোখে চোখ রাখলেন "স্টিল নট কনফার্মড"।

খান বললেন "মিনিস্ট্রি কী বলছে?"

মাথুর খানের দিকে তাকিয়ে হাসলেন "যা বলে"।

খান মাথা নাড়লেন "এভাবে কিন্তু চলতে পারে না। কিছুতেই পারে না"।
মাথুর বললেন "সে তো পারেই না। কিন্তু এর সলিউশন কী?"
খান বললেন "এক কাজ করতে পারে তো। সব কাশ্মীরিদেরই একদিন গুলি করে উড়িয়ে দিক। সব প্রবলেম সলভড"।
মাথুর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "দিল্লিতে বসে থেকে আজকাল আমারও এটাই মনে হয়। এর থেকে ভাল সলিউশন বোধহয় আর কিছু হয় না। লোকগুলো কী করবে? কিছু তো করার নেই আর। এপারে থাকলে আমরা মারছি, ওপারে গেলে পাকিস্তান। বাই দ্য ওয়ে, এখনও এ ঘটনার দায় কেউ স্বীকার করে নি"।
খান বললেন "করবে। এত তাড়া কীসের?"
মাথুর বললেন "হু। শ্রীনগরে রেড অ্যালার্ট জারি হয়েছে। তা সত্ত্বেও লাল চকে মিছিল বেরিয়েছিল। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ পোড়ানো হয়েছে। আর্মি টিয়ার শেল ছুঁড়ছিল, তাতেই পালিয়েছে। গুলি চালাবার মত অবস্থা ছিল। তবে চালানো হয় নি"।
খান বললেন "ইসলামাবাদ শুনলাম আবার অসভ্যতা শুরু করেছে"।
মাথুর চোখ ছোট করলেন "কীরকম অসভ্যতা?"
খান বললেন "যা করে। আম কাশ্মীরীর লাইফ হেল করছে ইন্ডিয়ান আর্মি, এসব বলছে"।
মাথুর আলতো স্বরে বললেন "ব্লাডি সোয়াইন"।
খান বললেন "কী টাইপের মেটিরিয়াল ইউজ করেছে কিছু জানা গেল?"
মাথুর ফ্যাকাসে মুখে বললেন "না"।
খান কয়েক সেকেন্ড মাথুরের দিকে তাকিয়ে বললেন "পাঠানকোট?"
মাথুর মাথা নাড়লেন "কনফার্ম নই। হতে পারে"।
খান বললেন "পাঠানকোটের মিসিং অফিসারদের লিস্ট তোমার মুখস্থ ছিল না?"
মাথুর বললেন "হু"।
খান বললেন "ক'জনকে ট্র্যাক করা গেছে?"
মাথুর বললেন "একজনকেও না"।
খান বললেন "ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট"?
মাথুর বললেন "না"।
ঘরে নক হল। মাথুর গলা তুললেন "কাম ইন"।
তুষার রঙ্গনাথন ঘরে ঢুকলেন। তুষার ছোট খাটো লোক। তবে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময় একজন মানুষ। মাথুর এবং খানের সিনিয়র।
দুজনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তুষার বললেন "ডিপার্টমেন্ট রেখে কী হবে? বন্ধ করে দিলেই তো হয়"!
মাথুর বললেন "কোন লিড ছিল না স্যার আজকে"।

তুষার চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন "সমস্যা হল বাস্তবটা সিনেমা নয়। তাহলে একজন উইস্পারকে পাঠানো যেত শ্রীনগরে। সিনেমার নাম হত উইস্পার ফির ভি জিন্দা হ্যায়"।

মাথুর হাসলেন। খান হাসলেন না। বললেন "কাশ্মীর হাতের বাইরে চলে গেছে স্যার"।

তুষার খানের চোখে চোখ রাখলেন "তোমার কী মনে হয় খান? কোনটা হাতের মধ্যে আছে? কাশ্মীর ছাড়া সব ওকে? তুমি এখানে শিওর করে বলতে পারবে বাংলাদেশ কিংবা বার্মা থেকে যারা ইন্ডিয়াতে ট্রেসপাসিং করছে তার মধ্যে লস্কর বা আই এস আই এস আছে কি না? কিংবা অরুণাচল"?

খান মাথুরের দিকে তাকালেন। মাথুর বললেন "বি এস এফ এখন অনেক বেশি অ্যালার্ট স্যার"।

তুষার বললেন "স্টিল ল্যাপিং। স্টিল। বর্ডার ইজ নট সিকিউরড। সব থেকে বড় কথা, কাশ্মীরে বারবার নজর কাড়ছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না বাকি সব জায়গা সেফ"।

খান বললেন "কাশ্মীর নিয়ে আমাদের বোধ হয় আরও বেশি ভাবতে হবে। অনেক নরম, অনেক ভালভাবে অ্যাপ্রোচ করার জায়গা আছে, আমি এখনও বিশ্বাস করি"।

তুষার খানের দিকে তাকিয়ে বললেন "খুব ভালভাবে বুঝেছি তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ। মিনিস্টারের সামনে বলতে পারবে?"

খান বললেন "না পারার কিছু নেই স্যার"।

তুষার মাথুরের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন "মীর্জা একসময় আমাদের সব থেকে বিশ্বস্ত অফিসার ছিল"।

মাথুর কিছু বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন।

১৫।

এগারোটা নাগাদ জেঠু বেরোল। কাকিমা রান্না করছিল। মিনি রান্নাঘরে ঢুকল "এই কাকিমা, চল"।

কাকিমা বলল "তুই যা। আমি পারছি না। উফ, কত কাজ জানিস?"

মিনি ঠোঁট ফুলাল "তুমি যাবে না?"

কাকিমা বলল "আজ বিশুর মা আসবে না। আমার কত কাজ জানিস?"

মিনি কাঁধ ঝাঁকাল "ওকে। আমাকে চাবিটা দাও"।

কাকিমা চোখ বড় করল "দাদার ঘরের"?

মিনি বলল "হ্যাঁ। দাও"।

কাকিমা বলল "আমি কিন্তু জানি না মিনি, এখানকার জিনিস সেখানেই থাকা চাই"।
মিনি বলল "এই তুমি দাও তো"।
জেঠু ঘরের চাবি কাকিমাকে দিয়ে গেছিল। খানিকটা ইতস্তত করে কাকিমা সেই চাবিটা মিনিকে দিল। মিনি চাবিটা নিয়ে দোতলায় উঠল। ঘরের দরজাটা খুলতে তার একটু বুক দুরুদুরু করছিল বটে কিন্তু প্রবল কৌতূহল সেই ভাবটাকে কমিয়ে দিচ্ছিল।
দরজা খুলে ঘরের আলো জ্বালল মিনি। জেঠুর ঘর বরাবরই ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মিনির মনে পড়ে ছোটবেলায় অনেকটা সময় জেঠুর ঘরেই কাটাত সে।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জেঠু কেমন দূর হয়ে গেল। নিজের মতই থাকে, মিশে না কারো সাথে। একটু খ্যাপাটেও হল বটে।
সবার ঘরেই একটা গন্ধ থাকে। যে গন্ধটা থাকলে মনে হয় তার ঘরে এলাম।
জেঠুর ঘরে চিরকালই একটা চন্দনের গন্ধ থাকে। জেঠু না থাকলেও সে গন্ধটা যেন অবহেলাভাবে ছিল।
বেশ বড় ঘর। বইয়ের একটা বড় আলমারি। একটা ডবল বেড খাট। খাটের সামনেই টিভি।
মিনি আলমারির দিকে এগোল। বেশ খানিকক্ষণ আলমারির বইগুলো দেখল। জেঠু বরাবরই বই পত্র পড়তে ভালোবাসে। শেয়ার বাজারেরও বেশ কিছু বই আছে। বিশ্ব সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, সুনীল, শীর্ষেন্দুর সঙ্গে নতুন সংযোজন বেশ কয়েকটা ধর্মের বই। মিনি দেখল কোরান ছাড়াও বাইবেল, গীতাও আছে। জেঠুর পড়াশোনার পরিধি বরাবরই অনেকটা বেশি। ক্লাস নাইনে জেঠু কয়েকদিন বাংলা ব্যাকরণ দেখিয়েছিল।
আলমারিতে তেমন কিছু পেল না।
মনে পড়ল ওষুধের বাক্সের কথা। খাটের পাশেই সেটা রাখা। মিনি ভাল করে খুঁজল। কালকের লিফলেটটা পেল না। তবে কি লুকিয়ে ফেলল জেঠু?
কী এমন গুরুত্বপূর্ণ লিফলেটটা যে লুকিয়ে ফেলতে হবে? মিনি বেশ খানিকক্ষণ ঘরের চারদিকে তাকাল। কোথাও লিফলেটটা নেই। কী মনে হতে খাটের তোষকটা তুলতেই মুখে হাসি ফুটে উঠল তার। একগাদা বিলের সঙ্গে লিফলেটটাও আছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না লিফলেট দেখে। মিনি পায়চারি শুরু করল। লিফলেটটা নিয়ে যাওয়া চলবে না। জেঠু বুঝে যাবে। কয়েক মিনিট হাঁটাহাঁটি করে সে তড়িঘড়ি নিচে নেমে গেল।
কাকিমা দেখে বলল "কী হে গোয়েন্দা, তল্লাশি হল?"
মিনি কাকিমার কথার উত্তর দিল না। জোর পায়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। মোবাইলটা নিয়ে আবার দোতলায় গেল।

মোবাইলটা দিয়ে লিফলেটের ফটো তুলে তোষকটা আগের মত সাজিয়ে রেখে দরজায় তালা দিয়ে নিচে নেমে গেল।
জেঠুর এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা না তবু তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল।
রান্নাঘরে ঢুকে টুল পেতে বসল।
কাকিমা বলল "কীরে কী হল?"
মিনি বলল "জল দাও তো। কেন জানিনা খুব টেনশন হচ্ছে"।
কাকিমা কোন কথা না বলে জলের বোতলটা এগিয়ে দিল ওকে। মিনি এক ঢোকে অনেকটা জল খেয়ে মোবাইলটা বের করে গ্যালারি খুলে কাকিমাকে দেখাল "এই দেখ"।
কাকিমা লিফলেটের ছবিটা দেখে অবাক হয়ে বলল "কী এটা?"
মিনি বলল "তোমাকে বলেছিলাম না জেঠুর ঘরে এই লিফলেটটা কাল আমি দেখেছিলাম। এখন গিয়ে দেখি নেই। তারপর দেখলাম তোষকের তলায় লুকনো"।
কাকিমা গালে হাত দিল "তুই তোষকের তলাও সার্চ করেছিস?"
মিনি বলল "দেখো না দেখো না, কিছু বুঝতে পারছ কী লেখা আছে?"
কাকিমা বলল "ধুস, আমি কী করে বুঝব কী লেখা আছে? আমি এসব ভাষা বুঝি নাকি?"
মিনি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে হাসি মুখে বলল "আইডিয়া"।
কাকিমা বলল "কী?"
মিনি বলল "আমাদের ক্লাসের মেহেজাবিন আরবী জানে। ওকে জিজ্ঞেস করি কী লেখা আছে। করি?"
কাকিমা মিনির দিকে তাকাল "মেহেজাবিন কাউকে বলে দেয় যদি?"
মিনি বলল "না না, বলবে না। আমরা খুব ভাল বন্ধু। দাঁড়াও এক মিনিট"।
মিনি মেহজাবিনকে হোয়াটস অ্যাপে ছবিটা পাঠাল। মেহেজাবিন অনলাইনেই ছিল। ছবিটা দেখে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তাকে কলব্যাক করল, মিনি হুড়মুড় করে ফোনটা ধরল "হ্যাঁরে, দেখলি যেটা পাঠালাম?"
মেহেজাবিন ভয়ার্ত গলায় বলল "এসব কোত্থেকে পেলি তুই?"
মিনি একটু থমকে গেল। বুঝল লিফলেটটায় কিছু একটা চাপের ব্যাপার আছে। বলল "আরে এই তো আজ খবরের কাগজের সঙ্গে এসেছে। ভাবলাম কিছুই তো বুঝতে পারছি না ভাষা তোকে পাঠাই। কেন রে কী লেখা আছে?"
মেহেজাবিন বলল "আরে এ তো ডেঞ্জারাস জিনিস। কাশ্মীর কী আজাদি, ভারত কী বরবাদি এসব লেখা। এসব জিনিস আজকাল কাগজের সঙ্গে দিচ্ছে? কী সর্বনাশ?!"
মিনি বড় বড় চোখ করে কাকিমার দিকে তাকাল। কাকিমা ইশারায় জিজ্ঞেস করল "কী?"

মিনি মেহজাবিনকে বলল "ওকে ওকে তুই ওটা ডিলিট করে দে শিপশিরি আমি লিফলেটটা ছিঁড়ে দিচ্ছি এখনই, কাউকে কিছু বলবি না কিন্তু"।
মেহজাবিন বলল "কী যে করিস, আচ্ছা শোন, আমি আজ কলেজ ডুব মেরেছি"।
মিনি হি হি করে হেসে বলল "আমিও"।
মেহজাবিন বলল "কী করছিস?"
মিনি বলল "পরে বলছি রাখছি এখন"।
মেহজাবিন কিছু বলার আগেই ফোনটা কেটে দিল মিনি।
কাকিমা বলল "কী রে কী হয়েছে?"
মিনি কাকিমার দিকে তাকিয়ে হাসির ভান করল "কিছু না কিছু না, এমনি টুথপেস্টের অ্যাড ওটা"।

১৬।

দিল্লি এয়ারপোর্টেই বসে ছিল বীরেন। তার মাথা কাজ করছিল না। সে ভাবতেই পারছিল না যে জায়গা ছেড়ে খানিকক্ষণ আগেই সে এসেছে সেখানে এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে যাবে।

টিভিতে যে গাড়িটা দেখাচ্ছিল, কেন জানে না তার মনে হচ্ছিল ওই একই গাড়িতে তাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে এসেছেন মীর্জা। যদি তদন্ত হয়, যদি সিসিটিভি ফুটেজে তার ছবি থাকে তবে?

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এয়ারপোর্টের ভেতরেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হচ্ছিল তার কপালে। ঘন্টাখানেক চুপচাপ বসে থেকে ফোনটা অন করল বীরেন। বেশ কয়েকটা মেসেজ এসেছে মোবাইলে। সবক টাই জ্যোতির্ময়ের।
"কোথায়?"
"স্টিল নট রিচড?"
"কল শার্প"। ইত্যাদি।
সে ফোনটা নাড়াচাড়া করতে করতে জ্যোতির্ময়কে ফোন করল। একটা রিং হতেই ফোনটা তুললেন জ্যোতির্ময় "এতক্ষণ কী হয়েছিল? ফ্লাইট তো ঘন্টা খানেকেরও বেশি হয়ে গেল পৌঁছেছে"। গলায় ধমকের ভাব স্পষ্ট।
বীরেন বলল "চার্জ চলে গিয়েছিল। এয়ারপোর্টেই চার্জ দিলাম। আমি কি কলকাতা ফিরব এবার?"
জ্যোতির্ময় বললেন "কেন? আমি বলেছি তোমায় ফিরতে?"
বীরেনের মাথাটা গরম হল খানিকটা "কোথায় যেতে হবে তবে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "তোমার কাছাকাছি টিভি আছে? কাশ্মীরে কী হয়েছে দেখেছ?"
বীরেন থতমত খেয়ে মিথ্যা করেই বলল "না, আমি জানি না তো! কী হয়েছে কাশ্মীরে?"
জ্যোতির্ময় কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন "যা হয়েছে ভালর জন্যই হয়েছে। যা হবে ভালর জন্যই হবে। শোন, এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যাও, বাইরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, নাম্বার ডি এল ১৪২৪। হোটেল সেন্টিনেলে তিনশো পাঁচ নাম্বার রুম বুক করা আছে সায়ক বড়ালের নামে। রাতটা ওখানেই কাটাও। আর যে প্রিপেড সিমটা আছে কলকাতার, ঐ সিমটাই মোবাইলে ভরে নাও। এই সিমটা কোথাও ডাস্টবিন দেখে নষ্ট করে ফেলে দাও"।
বীরেন বলল "যদি আমি আপনার কথা না শুনে বাড়ি চলে যাই এখন?"
জ্যোতির্ময় ঠান্ডা গলায় বললেন "যেতে পারো, কোন চাপ নেই। তবে তোমার বোন এখন শান্ত সান্যালের কোচিঙে পড়েন, তাই না?"
বীরেনের হঠাৎ করে খুব ঠান্ডা লাগতে লাগল। সেই পুরনো অস্বস্তিটা ফিরে আসছিল যেটা জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কথা বললেই তার হয়। সে বলল "যাচ্ছি। রাখছি এখন"। ফোনটা রেখে মুখ ঢেকে খানিকক্ষণ বসে থেকে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোল সে। এয়ারপোর্টের বাইরে থেকে একটা ট্যাক্সিকে বলতেই যেতে রাজি হয়ে গেল ট্যাক্সিওয়ালা। ব্যাগটা সিটের পাশে রেখে চোখ বুজল সে। পাশে চলে যাওয়া কর্মব্যস্ত দিল্লি শহরের কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করছিল না। বাড়িতে ফোন করল কিছুক্ষণ পরে। বাবা ধরল, গলায় উত্তেজনা "বীরে তোর খবর কী?"
বীরেন বলল "একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম না, হঠাৎ করে ডাক এসে গেছে দিল্লি থেকে। চলে এলাম"।
বাবা অবাক গলায় বলল "টাকা পেলি কোথায়? কীসে গেলি?"
বীরেন বলল "বন্ধুদের থেকে ধার করলাম। প্লেনেই চলে এলাম। কাল সকালে ইন্টারভিউ"।
বাবা গম্ভীর গলায় বলল "সে কথাটা একবার আমাকে ফোন করে বলে দিলে কী হত? আমরা কী চিন্তা করি না নাকি? যখনই ফোন করি বলে ফোন অফ। তোর মাকে তো জানিস, খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।"
বীরেন বলল "আর বোল না, ফোনের চার্জার নিয়ে আসি নি তো, চার্জারের ঝামেলায়..."
বাবা ধমক লাগাল "থাম, অন্য কারো একটা ফোন জোগাড় করে ফোন করা যায় না? এসব অজুহাত দিতে হবে না। শোন এখন মাকে দিচ্ছি না, ফোন ধরলেই তো

চিৎকার জুড়বে। তুই মন দিয়ে ইন্টারভিউটা দে। বেরিয়ে ফোন করবি, তখন মার সঙ্গে কথা বলাব"।

বীরেন "আচ্ছা বাবা" বলে ফোনটা রাখল। তার কান্না পাচ্ছিল খুব।

অরিত্রি ফোন করছে। বীরেন ধরল "হ্যাঁ বল"।

অরিত্রি বলল "তুই কোথায়?"

বীরেন বলল "আছি এক জায়গায়। কী হয়েছে বল"।

অরিত্রি বলল "তোকে তো বলাই হয় নি কাল কী হয়েছে। যা তা কান্ড ঘটেছে"।

বীরেন বলল "আমার এখন শোনার সময় নেই। রাখছি"।

অরিত্রি অবাক হয়ে গেল "কেন? কী এমন রাজ কাজ করছিস যে তোর শোনার সময় নেই? কোথায় আছিস তুই?"

বীরেন বলল "পরে বলছি। রাখলাম এখন"।

বীরেন ফোনটা কেটে দিল। অরিত্রি আবার ফোন করছিল বীরেন ধরল না। ট্যাক্সি ড্রাইভার হঠাৎ স্পষ্ট বাংলায় বলে উঠল "ভাইজান কি কলকাতার?"

বীরেন অবাক হয়ে বলল "হ্যাঁ, আপনিও?"

ট্যাক্সি ড্রাইভার হে হে করে খানিকটা হেসে বলল "না না ভাই, আমি কলকাতার না"।

বীরেন বলল "তবে?"

ড্রাইভার বলল "আপনাগো কাছেই থাকি। তবে পাসপোর্ট লাগে। আমার বাড়ি নোয়াখালি"।

বীরেনের অবাক হবার পরিমাণ বাড়ল, "তবে? এখানে কী করে এলে?"

ড্রাইভার বলল "সে ভাইজান অনেক কথা"।

বীরেন কী বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে গেল। ড্রাইভার বলল "আর কিছু করি না করি হিন্দিটা ভাল শিইখ্যা লইছি। কাম হয় প্রচুর। তবে বাঙালি দেখলে খুশি হই। কেমন একটা টান আসে ভাইজান"।

বীরেন বলল "তোমার নাম কী?"

ড্রাইভার বলল "সুমন। হিন্দু"।

বীরেন বলল "ওপারে কোন অত্যাচার..."

ড্রাইভার মাথা নাড়ল "না না সেসব না ভাই। ওপারে আসলে কিছু ছিল না আমাগো। মা আর বাবা ভিটা আগলাইয়া ছিল। মামা মাসী, কাকা কাকীরা সবাই বারাসাত

মধ্যমগ্রামে বাড়ি করসে। আমরাই যাই না। ম চইল্যা যাবার পর একদিন বাবা কইল চ, আর এই দেশে মন টেকে না। চইল্যা আইলাম"।
বীরেন বলল "চলে এলে মানে? কোন অসুবিধা হল না?"
সুমন দাঁত বের করল "না ভাই, বনগাঁ বর্ডারে লোক আসে। সে শাহেনশা লোক। বিডি আর বি এস এফ এদিক দিয়া ওদিক গেলেই পার কইর‍্যা দেবে। আইস্যা কিছুদিন বারাসাত ছিলাম, তারপর এক এজেন্সী ধইর‍্যা দিল্লি চইল্যা আইসি"।
বীরেন ট্যাক্সির সিটে ক্লান্ত মাথা রাখল "তা ভালই করেছ যা করেছ"। সুমন বকবক করতে লাগল। বীরেন চুপচাপ বাইরের দিল্লি দেখছিল। সুমন একটা দিল্লি গলির সামনে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল "রিক্সা লইয়া চইল্যা যান ভাই। গলির ভেতরে। আপনার আমারে দরকার হইলে ফোন নাম্বার রাইখ্যা দিন। ফোন কইর‍্যা লইবেন। দেহেন"।
সুমনের নাম্বার মোবাইলে নিয়ে নিল বীরেন। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে রিক্সা স্ট্যান্ডের দিকে এগোল।

১৭।
মিনি ঘরে চুপচাপ বসেছিল। ঠিক কী করতে হবে, কিছুতেই ঠিক করতে পারছিল না। কাকিমা যখন জিজ্ঞেস করল তখন কেন যে সে মিথ্যা বলল তা নিজেও বুঝতে পারছিল না। ভীষণভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিল সে।
মা ফোন করছিল, ধরবে না ধরবে না করেও ধরল, "বল মা"।
ওপাশ থেকে মার রাগী গলা ভেসে এল "কীরে, তুই কী শুরু করেছিস? কলেজ না গিয়ে বাড়িতেই ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিস?"
অন্যান্য দিন হলে কিছু না কিছু একটা ঠিক বুঝিয়ে দিত মাকে। আজ পারল না।
মিনি বলল "এই ইচ্ছা করছিল না"।
"ইচ্ছা করছিল না মানে? কী বলছিস তুই?"
মিনি বলল "মা শোন না, তুমি কবে আসবে? আজ আসতে পারবে?"
মা অবাক হল "কেন? কী হয়েছে? কী করলি আবার?"
মিনি বলল "ভাল লাগছে না"।
মা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল "ছেলেটা কে?"
মিনি বলল "ছেলে নেই কোন"।
"তবে?"
মিনি বলল "আছে ব্যাপার। ফোনে বোঝাতে পারব না। তুমি এলে তারপরে বলব"।
মা বলল "বেশ। তবে আজকে হবে না। কাল সকাল সকাল পৌঁছে যাব"।
মিনি বলল "ঠিক আছে। রাখছি"।

মা বলল "আচ্ছা, শোন না, একটু বল কী ব্যাপার? নইলে টেনশনে পড়ে যাব। এখানেও কম টেনশন যাচ্ছে না। মামীর শরীর খুব একটা ভাল না। ওভারিতে একটা টিউমার ধরা পড়েছে। মনে হয় ওভারি কেটে বাদ দিতে হবে। তুই আর টেনশন বাড়াস না তো!"

মিনি উঠে দরজা বন্ধ করে খাটে বসল "আচ্ছা, বলছি, শোন না মা, জেঠুর আচরণ না একটু না কেমন কেমন লাগছে"।

মা বলল "কেন কী হয়েছে? তোকে বা তোর কাকীমাকে কিছু বলেছে? জানিসই তো তোর জেঠু একটু..."

মিনি মাকে থামিয়ে দিয়ে বলল "না সেসব কিছু না। আচরণটা একটু অন্যরকম। তুমি দেখেছ আজকাল জেঠুর কাছে কীরকম টাইপের লোকজন আসছে? কোথাকার কোথাকার কেমন কেমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত লোক। তুমি তো কাল ছিলে না, একটা ছেলে এসে বলল এটা কী সায়ক না কার বাড়ি। আমি আর কাকিমা তো কিছুই বুঝলাম না। জেঠুর কাছে পাঠালাম। জেঠু আবার ছেলেটাকে খাওয়াতে বলল। ছেলেটা কেমন ভয়ে ভয়ে খেল। তারপর কোথায় যেন চলে গেল। পাড়ার কেমন কেমন সব ছেলেরা আমাদের বাড়িতে আসে আজকাল। তাছাড়া..."

মা বলল "তাছাড়া আবার কী?"

মিনি বলল "জেঠু একটা লিফলেট লুকিয়ে রেখেছিল তোষকের তলায়। তাতে কীসব দেশবিরোধী কথা লেখা আছে। আমার সবকিছু একটু অদ্ভুত লাগছে মা"। মা হাসল "ধুস পাগলী, তুই একটা পাগলীই থেকে গেলি। আরে তুই জানিস না তোর জেঠুর একটু মাথাখারাপ আছে? অকারণ ভয় পাস না তো! ছুটি যখন নিয়েছিস তখন মন দিয়ে পড় না ঘুমিয়ে। আমি রাখলাম এখন, কাল আসছি"। দরজাটা কেউ নক করছিল। মিনি বলল "ফোনটা রাখি মা, কেউ এসেছে মনে হয়"।

মা বলল "ঠিক আছে। রাখি এখন"।

ফোনটা কেটে মিনি দরজা খুলে দেখল জেঠু দাঁড়িয়ে আছে। নিজের অজান্তেই তার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জেঠু ঠান্ডা গলায় বলল "আমার ঘরে গেছিলি?

১৮।

ঘিঞ্জি জায়গা হলেও হোটেলটা ভাল। পরিচ্ছন্ন। বীরেন ঘরে ঢুকে জামা কাপড় না ছেড়েই খাটে শুয়ে পড়ল। বেশ খানিকক্ষণ শুয়ে থাকার পরে টিভি চালাল। টিভিতে বার বার নিউজ চ্যানেলে কাশ্মীরের ঘটনাটাই দেখাচ্ছে। জানা গেছে এই আত্মঘাতী হামলায় গাড়ির ভেতরে যে ছিল সেও বাঁচে নি। তাকে সনাক্তকরণই করা যায় নি এত বড় মাপের বিস্ফোরণ হয়েছে।

সে বাংলা নিউজ চ্যানেল দিল। যে চারজন জওয়ান মারা গেছে তার মধ্যে একজন পশ্চিমবঙ্গের। মা আর বউয়ের কান্না দেখাচ্ছে। বাবা ভাঙা গলায় বলছে ছেলে কিছুদিন আগেই বিয়ে করেছে। ভাল করে সংসার করার আগেই চলে গেল। বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে। সংসারটা ভেসে গেল। দেশের জন্য ছেলেটা না হয় শহীদ হল কিন্তু বাকি জীবনটা তার বাবা মা কী নিয়ে থাকবে আর?

বীরেনের বমি পেয়ে গেল। সে টিভি বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকে বমি করে কল চালিয়ে তার তলায় মাথা দিয়ে বসে থাকল। টাওয়েল জড়িয়ে ঘরে এসে কয়েক মিনিট স্থির হয়ে বসেছিল এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

বীরেন ব্যাগটা হাতড়ে ব্যাগ থেকে একটা টি শার্ট আর হাফ প্যান্ট তাড়াতাড়ি পরে দরজা খুলল। বাইরে একজন ফর্সা মত ছেলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। বীরেন জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাল। ছেলেটা বাংলাতেই বলল "আমি রাকেশ। খামটা দিন"।

বীরেন ব্যাগ থেকে খামটা বের করে দিল।

রাকেশ বলল "বীর্জা বেঁচে আছেন। চিন্তা করবেন না"।

বীরেন চমকে ছেলেটার দিকে তাকাল। রাকেশ রুমের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল "বসুন। চিন্তার কিছু নেই। আমিও বাঙালি"।

বীরেন বুঝল ছেলেটাকে জ্যোতির্ময়ই পাঠিয়েছেন। সে সোফায় বসে রাকেশের দিকে তাকাল।

রাকেশ বীরেনের দিকে তাকিয়ে বলল "হোটেলের রুম সার্ভিসে ফোন করলেই আপনি যা চান তাই অর্ডার করতে পারবেন। চিন্তা করার কিছু নেই। টাকা দিতে হবে না"।

বীরেন রাকেশের দিকে তাকাল। এরা কি তবে জঙ্গী? তাকেও ধীরে ধীরে নিজেদের সবকিছুতে ফাঁসিয়ে দিচ্ছে?

সে বলল "বীর্জা বেঁচে আছেন আপনি কী করে জানলেন?"

রাকেশ সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল "ভোর চারটে পঞ্চাশ। ইন্ডিগোর ফ্লাইট"।

বীরেন অবাক হয়ে বলল "মানে?"

ছেলেটা পকেট থেকে একটা ব্যাগ থেকে একটা প্রিন্ট আউট বের করে তার হাতে দিয়ে বলল "ই টিকিট আছে। আই কার্ড নিয়ে রাত দুটোর সময় এয়ারপোর্টে ঢুকে যাবেন। একটা নাগাদ হোটেলের নিচে রিক্সা দাঁড়িয়ে থাকবে। সে বড় রাস্তায় নিয়ে যাবে। সুমনকেই বলা আছে। ও আপনাকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দেবে। চেক ইন করে বোর্ডিং পাস নিয়ে নেবেন"।

বীরেন কয়েক সেকেন্ড ছেলেটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল "কোলকাতা যাব তো?"

রাকেশ হাসল "নাহ, মুম্বই। যে ব্যাগ আছে সেটা নিয়েই যাবেন। আর ব্যাগ চেঞ্জ

করতে হবে না। সুমন আপনাকে একটা রেন কোট দিয়ে দেবে। ওটা ব্যাগে ভরে নেবেন। মুম্বইতে এখন মারাত্মক বৃষ্টি হচ্ছে"।

বীরেন রেগে গেল "ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি? আমি যেতে বাধ্য নই"।

রাকেশ বলল "কেন বলুন তো অকারণ রেগে যাচ্ছেন? কিছু করতে পারবেন রেগে গিয়ে? ঘুরছেন যখন ঘুরুন না। অত চিন্তা করার তো কিছু নেই"।

বীরেন বলল "এভাবে আমাকে নিয়ে কী করতে চান আপনারা? গিনিপিগ পেয়েছেন? আমাকে... মীর্জার সঙ্গে কথা বলান। আমি জানতে চাই উনি সত্যিই বেঁচে আছেন কী না"।

রাকেশ বলল "মুম্বইতে পৌঁছে বলে দেবেন। চিন্তার কিছু নেই"।

বীরেন বলল "আপনারা... টেররিস্ট?"

রাকেশ বীরেনের কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট ব্যাগ বের করে সামনের টেবিলে রেখে বলল "একটা ছোট কাজ আছে। হোটেল থেকে বেরনোর সময় আপনার পাশের রুমের দরজায় এই ব্যাগটা নামিয়ে দিয়ে চলে যাবেন"।

বীরেনের ইচ্ছা হচ্ছিল রাকেশকে মেরেই ফেলে। শুধু বার বার মার মুখটা মনে পড়ছিল বলে সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। রাকেশ উঠল, "এই হোটেলে কলকাতার শেফ আছে, দারুণ বিরিয়ানি বানায়, খেয়ে নিন, মিস করবেন না"।

বীরেন বলল "মুম্বই থেকে আবার কোথায় পাঠাবেন আমাকে? জোহাই?"

রাকেশ বলল "জানি না, স্যার যেভাবে বলবেন গোটা ব্যাপারটাই সেভাবে হবে"।

বীরেন বলল "আপনার বাড়িতে কেউ নেই? বাবা মা ভাই বোন? আপনার মনে হয় না কাউকে ব্ল্যাকমেল করে এভাবে কাজ করানো যায় না?"

রাকেশ বলল "আপনাকে কোন কাজ দেওয়া হয় নি তো এখনও"।

বীরেন বলল "এই যে ব্যাগটা নামাতে বললেন?"

রাকেশ বলল "ধুস, এটা কোন কাজ হল নাকি! যাক গে, ভুলবেন না। খেয়ে দেয়ে এখনই ঘুমিয়ে নিন। মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে নিন"।

বীরেন কয়েক সেকেন্ড রাকেশের দিকে তাকিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল "গো টু হেল"।

রাকেশ হাসতে হাসতে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

১৯।

একটা স্টেশনে সে ওভারব্রিজে উঠতে যাচ্ছিল, খানিকটা ওঠার পর দেখল সেটা বাতিল ওভারব্রিজ। ওভারব্রিজের মেঝেটা যে কোন সময় ভেঙে পড়বে। সে তড়িঘড়ি নেমে স্টেশন থেকে বেরোতে চাইছে, খেয়াল হল প্রতিটা এক্সিটে টিকিট চেকার দাঁড়িয়ে আছে আর তার কাছে কোন টিকিট নেই। চারদিকের সব লোক তাকে

সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখছে, কেউ একজন পুলিশকে খবর দিয়েছে। সবাই তাকে ঘিরে ধরছে।

স্বপ্নটা দেখে ধড় মড় করে উঠে বসল বীরেন। রুমে এসি চলছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ঘেমে যাচ্ছিল।

আলো জ্বেলেই ঘুমিয়েছিল সে। মোবাইলে দেখল রাত বারোটা বাজে। দশটায় ঘুমিয়েছিল। বুঝতে পারছিল ঠিক ঠাক ঘুম হয়ত আর এ জন্মে হবে না তার। উঠে মুখ ধুয়ে খানিকক্ষণ বসে গীজার চালিয়ে গরম জল করে স্নান করে তৈরী হল সে। চোখের তলায় কালি জমছে আয়নায় দেখা যাচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে ঘরে এসে ব্যাগ খুলল। সায়ক বড়াল। আধার কার্ড আর প্যান কার্ড। কার বাপের সাধ্যি বলবে এটা তার না? সুন্দরভাবে তার ছবি লাগানো আছে। সাড়ে বারোটা নাগাদ সে হোটেলের রুম লক করল। ছোট ব্যাগটা পাশের রুমের দরজায় রাখল।

রিসেপশনের ভদ্রলোক টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। তাকে ঘুম থেকে তুলে চাবিটা দিয়ে হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াতেই মোবাইলটা বেজে উঠল। ধরল সে "হ্যালো"।

"আপনি তো দেখছি বাঙালির কলঙ্ক"।

"কেন?"

"আধঘন্টা আগে তৈরী হয়ে নিচে নেমে গেছেন। বাই দ্য ওয়ে, ব্যাগটা..." "রেখেছি"।

"গুড। দেখুন হোটেলের সামনে দুটো রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। একজনের নাম সেলিম। দুজনেই ঘুমাচ্ছে অবশ্য। যার দাড়ি আছে তার নাম সেলিম। ওর ঘুম সহজে ভাঙে না। স্ট্রেট গিয়ে ওর পেটে একটা খোঁচা দিন। উঠে যাবে। সুমন দাঁড়িয়েই আছে। হ্যাপি জার্নি"।

ফোনটা কেটে গেল।

বীরেন ফোনটা পকেটে রেখে দেখল হোটেলের সামনেই দুটো রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে। সেলিমকে দেখেই বুঝতে পারল। এগিয়ে গিয়ে মৃদু স্বরে কাল "সেলিম"। সেলিম শুনল না। সম্ভবত আগের জন্মের আনারকলির স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিল। বীরেন সেলিমের পেটে জোরে একটা খোঁচা দিল।

সেলিম ধড়মড় করে উঠল "কউন মাদার..."

বলতে বলতে তার দিকে তাকিয়েই আর কোন দিকে না তাকিয়ে রিক্সার যাত্রীর জায়গা থেকে নেমে চালকের সিটে উঠে বসল। বীরেন রিক্সায় উঠল। সেলিম কোন কথা না বলে রিক্সা এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

সারাদিনের দিল্লি চাঁদনি চক রাত পৌনে একটাতেও ঘুমায় নি। অনেক দোকানই খোলা। কাবাবের দোকানগুলোতে এখনও ভিড়।

কোন কোন দোকানে কাজ চলছে। পুরনো দিল্লির একটা অদ্ভুত আমেজ আছে ছোটবেলায় শুনেছিল বীরেন। সে আমেজের খানিকটা দেখতে পেলেও উপভোগ করার মত জায়গায় সে ছিল না।

খানিকক্ষণ পরেই বড় রাস্তায় রিক্সা এসে দাঁড়াল। বীরেন রিক্সা থেকে নামতেই সেলিম একটা কথাও না বলে রিক্সা ঘুরিয়ে চলে গেল। সুমন তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল "আসেন ভাইজান। জলদি"।

বীরেন রাস্তা পেরিয়ে জিপ্সিতে উঠল। দেখল সিটের ওপর যত্ন করে একটা রেইনকোট রাখা। বীরেন বলল "এটা_"

সুমন বলল "ব্যাগে ভইরা নেন। বোম্বে তে মেলা বৃষ্টি হইতাসে। গাঁড় ফেইট্যা যাওয়া বৃষ্টি"।

বীরেন আর কথা না বলে রেইনকোটটা তার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। সুমন গাড়ি স্টার্ট করে বলল "সাহিল ভাই যে কী করে বুঝি না। আপনের হোটেলে যাওয়ার দরকার ছিল না কোন। এয়ারপোর্টে রাখলেই তো পারত"।
বীরেন বলল "সাহিল কে?"

সুমন জিভ কাটল "ওহ, রাকেশ ভাই"।

বীরেন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। মধ্যরাতের দিল্লি। দেশের রাজধানী। ভেবেছিল বাড়ির সবাইকে নিয়ে ঘুরতে আসবে। এভাবে, বিনা নোটিশে, কোন কিছু না জেনে যে এভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নি সে।

সুমন একাই বক বক করছিল। বাকি রাস্তা বীরেন কোন কথা বলল না আর।

চোখ বন্ধ করে বসে থাকল।

রাস্তা ফাঁকা ছিল। এয়ারপোর্ট পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না। সুমন বলল "যান ভাই, সাবধানে যান"।

জিপ্সি থেকে নামল বীরেন।

এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

২০।

খুব টেনশন হলে মিনির মাইগ্রেনের ব্যথাটা আবার বেড়ে যায়। জেঠুর প্রশ্নটা শুনে তার ঠিক সেটাই হল।

অন্য সময় হলে ব্যথাটা নিয়ে ছটফট করত, এবারে ব্যথাটাই তাকে বাঁচিয়ে দিল। জেঠুর প্রশ্নের উত্তরে ফ্যাকাসে হেসে কোনমতে বলল "হ্যাঁ, সারাদিন খুঁজতে

পেয়েছিলাম"।

জেঠু তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল "ওহ, ঠিক আছে। তবে এভাবে জলের মত স্যারিডন খাওয়া কিন্তু মোটেই ভাল নয় মিনি। তোর মা ফিরুক, আমি বলে দিচ্ছি ডাক্তার রায়কে একবার দেখিয়ে নে"।

মিনির দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সে কিছুতেই জেঠুর সামনে স্বাভাবিক হতে পারছিল না। বলল "আচ্ছা, সে দেখা যাবে, আমি একটু ঘুমাই জেঠু"।

জ্যোতির্ময় যেতে যেতে বললেন "ঠিক আছে। তবে আমি এবার স্যারিডনের স্ট্রিপটা লুকিয়ে রাখব। তুই আর পাবি না"।

মিনি দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে বসল।

মেহজাবিন ফোন করছে। মিনি ধরল, "বল"।

মেহজাবিন বলল "শোন না, এই জাস্ট মনে পড়ল, তিন চারদিন আগে, এরকম সেম লিফলেট আমি কোথাও একটা দেখেছি। কিন্তু কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না"।

মিনি হাসার চেষ্টা করল "ধুস, তুই এখনও লিফলেটটা নিয়ে চাপ নিয়ে আছিস। অত ভাবিস না তো!"

মেহজাবিন বলল "চাপ নেবো না? তুই জানিস, এই দেশে থেকেও আসলে আমাদের কতরকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়? একটুখানি টেনশন হলেই, কিংবা কোথাও সমস্যা তৈরী হলেই ঠারে ঠোরে বোঝানো শুরু হয়ে যায় এই দেশটা আসলে আমাদের না। পাকিস্তানে চলে গেলেই তো পারি। আজকে ভাব তো, এই লিফলেটটা তোর জায়গায় যদি আমি তোকে পাঠাতাম, আর তাতে এসব কথা লেখা থাকত, তাহলে কী হত? তোরা তো ভেবেই নিস, খাই ছিকল্ট এই দেশে থেকে আমরা দেশবিরোধী কাজ করে বেড়াই"।

মিনি রেগে গেল "ধুর পাগলী, তুই থাম তো, কী যা তা বলে যাচ্ছিস, এদেশ ওদেশ আবার কী, এসব তোর মাথায় কে ঢোকায়?"

মেহজাবিন বলল "কে আবার ঢোকাবে, প্রতিটা সময়, প্রতিটা মুহূর্তেই বুঝতে পারি। এখন সহ্য করে নিতে শিখছি"।

মিনি বলল "শোন, আর কে কী বলল জানি না, তবে আমি অন্তত কোনদিন এসব ভেবে তোর সঙ্গে কথা বলি নি। তুই দয়া করে এসব নিয়ে বেশি ভাবিস না"।

মেহজাবিন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল "আমি জানি তুই ভাবিস না। কিন্তু আমি বুঝতে পারি অনেকেই ভাবি। ক্লাসের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে সেদিন ইন্ডিয়া পাকিস্তান খেলার দিন দেখলি তো অর্ঘ্য কেমন হঠাৎ করে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি কাকে সাপোর্ট করছি। আমি যখন উল্টে জিজ্ঞেস করলাম তুই কাকে সাপোর্ট করছিস তখন চুপ করে গেল। হ্যাঁ, আমি জানি, অনেকেই আছে যারা এদেশে থেকেও

পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে, ইনফ্যাক্ট আমি নিজের চোখেও দেখেছি তাদের, কিন্তু সেসব অশিক্ষিত অ্যান্টি সোশ্যালদের সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলবে কেন বল তো? আমি তো তোদেরই বন্ধু। আর পাঁচ জনের সঙ্গে আমাকে সব সময় আলাদা করে আইডেন্টিফাই করে রাখা হবে কেন?"

মিনি বলল "শোন, মা, তুই চিল মার। ফ্রিজ থেকে একটা কোল্ড ড্রিংক বের করে খেয়ে তোর ঘুমিয়ে পড়। যত্তসব ভুল ভাল কথা ভেবে চলেছে পাগলীটা। কাল কলেজ আয়, তোর কান দুখান খুলে দি। শোন, কিছু লোক আছে যারা সব সময় দুটো দলের মধ্যে টেনশন তৈরী করেই যায়। যেখানে হিন্দু মুসলিম আছে, সেখানে ভারত পাকিস্তান, যেখানে দুজন হিন্দু আছে সেখানে বাঙাল ঘটি। আমরা তো বাঙাল, কত লোকের থেকে শুনেছি কেন আমরা এই দেশে আছি, আমাদের তো আসলে বাংলাদেশেই থাকা উচিত ছিল। কোই, আমি তো তাদের কখনই পাত্তা দিই নি। আমি জানি, তাদের কাজই হল এই জিনিসগুলো করা। সব কিছুর সঙ্গে সব কিছুকে পার্থক্য করা। আমরা তাঁত্ত দিয়ে থাকি, নিজেদের যোগ্যতায় আমাদের বাবা কাকারা চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। কোন সিচুয়েশনে, কেন একটা দেশ ছেড়ে মানুষজনকে চলে আসতে হয়েছিল, সেই সেনসিটিভ ইস্যুটা নিয়ে ক'টা লোক ঠিক ঠাক ভাবে ভেবে দেখে? মানুষের মনের গভীরতাই বা কতটুকু? একটা বর্ডারের প্রিভেজ নিয়ে নাল পড়া লোক রবীন্দ্রনাথকে বর্ডারবাজ বলে দেগে দিলে রবীন্দ্রনাথের গায়ে কি এতটুকুও কালির দাগ পড়ে? তুই খামোখাই সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছিস। এসব ছাড়। দেশ কার হয়? যে সময় মানুষ এই পৃথিবীতেও আসে নি তখনই বা কোন দেশ কাদের ছিল? কেউ কিছু বললে জাস্ট একটা কথাই ভাব। কে কী বলল, তাতে আমার ঘেঁচু যায়।"

মেহজাবিন হেসে ফেলল "ভাল লাগল তোর কথাগুলো। তবে শোন, লিফলেটটায় কিছু একটা স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা লেখা ছিল, তখন খুব একটা আমল দিই নি, কারণ কথাগুলো ছোট ছোট করে লেখা ছিল। এই তোর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মনে পড়ল"।

মিনি অবাক হয়ে বলল "স্বাধীনতা সংগ্রাম? সে আবার কী?"

মেহজাবিন বলল "আমি বুঝলাম না তেমন কিছু। ক্লিয়ার না ব্যাপারটা"।

মিনি একটু চুপ করে বলল "হবে কিছু একটা আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না তেমন"।

মেহজাবিন বলল "তার আগে আমি একটু ভাবার চেষ্টা করি লিফলেটটা আমি দেখেছি কোথায়। চল এখন রাখছি পরে কথা বলছি"।

ফোনটা কেটে গেল। মিনি তার মোবাইল গ্যালারি খুলে লিফলেটটার দিকে ভাল করে তাকাল।

জেঠুর কাছে এই লিফলেট কী করছে?

২১।

শেষ কবে ভোর রাতে এরকম দৌড়াদৌড়ি করেছিল মনে করতে পারছিল না বীরেন। বিমানবন্দরে সুমন নামিয়ে দিয়ে যাবার পরে সিকিউরিটি চেকিং করে প্লেনে উঠে বসল সে।

রাত হলেও চতুর্দিকে আলোর প্রাচুর্যে কোন সমস্যা হচ্ছিল না। এয়ার হোস্টেসদের না জিজ্ঞেস করেই নিজের জানলার ধারের সিটটায় বসে পড়ল সে। এত ভোরে হলেও প্লেনে যাত্রী ভর্তি। একবার চোখ বুলিয়ে বীরেন বুঝতে পারল অধিকাংশই ব্যবসায়ী বা উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী।

নিজেকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছিল তার। এমন কেউ, যার কিছুই করার নেই, শুধু যা হচ্ছে, সেই স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া। এয়ার হোস্টেসরা জানাতে শুরু করল আপতকালীন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। পাশের ভদ্রলোক কোন কারণে উশখুশ করছিলেন। বীরেন সেদিকে না তাকিয়ে জানলার বাইরে তাকাল। একটু পরেই দিল্লি ছাড়বে সে। একটা সময় ছিল যখন ম্যাপ পয়েন্টিং করতে করতে ভাবত কবে দেশের এই শহরগুলোয় যাবে। কলকাতা হয়ে পুরী বা দার্জিলিং প্লেনে যাওয়া মানেই বিরাট ব্যাপার ছিল তার কাছে। আর এই দুদিনে প্লেনে করে দেশের এক প্রান্ত থেকে ওপর প্রান্ত দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছে। অথচ পুরো ব্যাপারটাই ধোঁয়াশা হয়ে আছে। বীরেন শান্ত থাকার চেষ্টা করছিল পারছিল না।

পাশের ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে হিন্দিতে বললেন "আপনি স্মোক করেন?"

বীরেন মাথা নাড়ল।

ভদ্রলোক অসহায় ভঙ্গিতে বললেন "আমি করি। চেইন স্মোকার। এই আড়াই ঘন্টা মহা সমস্যা হবে"।

বীরেন কিছু বলল না। অন্য দিকে তাকাল।

ভদ্রলোক বললেন "আপনি মারাঠি?"

বীরেন ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল।

ভদ্রলোক বললেন "মারাঠি নন?"

বীরেন বলল "বাঙালি"।

ভদ্রলোক বললেন "ওহ, বাহ বাহ। টেগোর, আই লাভ মিস্টি দই এন্ড অল"।

বীরেন উত্তর দিল না। ভদ্রলোক সম্ভবত মজা করতে চাইছেন।

প্লেন রানওয়ে ধরে চলতে শুরু করেছে।
ভদ্রলোক বললেন "আমি কখনও কলকাতা যাই নি। আপনি কলকাতা থাকেন?"
বীরেন বলতে যাচ্ছিল সে কলকাতা থাকে না, পরক্ষণেই মনে পড়ল সায়ক বড়ালের ঠিকানা আসলে কলকাতার। সে আমতা আমতা করে বলল "হ্যাঁ"।
প্লেন গতি বাড়াচ্ছে, এই সময়টা অন্য কোন সময় হলে ভয় লাগত বীরেনের, এবার আর লাগল না, এরকম অনিশ্চিত জীবনে বেঁচে থাকাটাও কেমন বাহুল্য বলে মনে হচ্ছে দুদিন ধরে।
শরীর হালকা হতে শুরু করল, ঠিক ঠাক টেক অফ হবার পরে প্লেনের সব কিছু স্বাভাবিক হল। পাশের ভদ্রলোক বললেন "আমি আশরফ। আপনি?"
বীরেন বলল "সায়ক"।
আশরফ বললেন "ওহ। গুড নেম"।
বীরেন বিরক্ত হচ্ছিল। এই সময় একটু চোখ বুজে নিলে ভাল হত। মুম্বইতে তার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে কিছুই জানে না সে। রাতে ঘুম হল না সেভাবে। এ ভদ্রলোকের বকবকানির ঠ্যালায় প্লেনেও আর ঘুম হবে বলেও মনে হচ্ছে না।
আশরফ বললেন "স্মোকিং করতে না পারলেই আমার খিদে পায়। কিন্তু ফ্লাইটে কুড়ি টাকার স্যান্ডউইচ দুশো টাকা নেয়। মাল্টিপ্লেক্সেও দেখেছেন তো! এদিকে আমাদের মত পাবলিক সে সবই সোনামুখ করে টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছে। জাস্ট ভাবুন। বাঙালিরা কিন্তু খুব ইন্টেলেকচুয়াল হয়। আপনি নিশ্চয়ই এটা নিয়ে ভেবেছেন?"
বীরেন মুখে হে হে টাইপ হাসি এনে কাটাবার চেষ্টা করল। আশরফ বকবক করে যেতে লাগলেন "আমার এক বাঙালি বন্ধু ছিল। মুম্বইতেই থাকত ছেলেটা। খুব এই ইন্টেলেকচুয়ালটাইপ কথা বলত। এটা কেন হচ্ছে সেটা কেন হচ্ছে। বাঙালি ছাড়া মনে হয় আর কোন ইন্ডিয়ান এত প্রশ্ন করেন না বলুন?"
বীরেনের এবার অসহ্য লাগছিল। এ লোক তো বকেই চলেছে নিজের মনে। খ্যাপা ট্যাপা নাকি?
সে ঘুমোবার ভান করল। আশরফ তার ডান পাশের লোককে নিয়ে পড়লেন। বীরেন চোখ খুলল না গোটা রাস্তাটা। শেষের দিকটা ঘুম চলেও এসেছিল। ঘুম ভাঙল আশরফের ঠ্যালাতেই "উঠিয়ে উঠিয়ে, প্লেনেই কাটিয়ে দেবেন নাকি?"
বীরেন চোখ খুলল। চোখ খুলতেও কষ্ট হচ্ছিল। মুম্বই পৌঁছে গেছে প্লেন রানওয়েতে দাঁড়িয়েছে। এমন ঘুম যে সে কিছুই বুঝতে পারে নি। সবাই একে একে বেরোচ্ছে। বীরেন বসে ছিল। ঠিক করল সবাই বেরোলে তবেই বেরোবে।
সবাই বেরোলে ধীরে ধীরে প্লেন থেকে বেরোল সে। আশরফও তার পেছন পেছনই বেরোচ্ছিলেন।

প্লেন থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে নামার মুখে আশরফ হঠাৎ করে বলে উঠলেন "মুম্বইতে আমার বাঙালি ইন্টেলেকচুয়াল বন্ধুর নাম কী ছিল জানেন? সায়ক বড়াল।"
বীরেন চমকে আশরফের দিকে তাকাল।

২২।

সোমেন ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বসে ছিলেন। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। একবার মনে হল মিনিকে ডেকে দেবেন, তারপর ঠিক করলেন থাক, মেয়েটা ঘুমোক। বড় অনিয়ম করে আজকাল মিনি, মোবাইলটা আসার পরে এই এক রোগ শুরু হয়েছে। অফিসে আলোচনা করে জেনেছিলেন সব বাড়িতেই এক সমস্যা। যে সব বাড়িতে একসময় দশটার সময় আলো নিভে যেত, সে সব বাড়ির ছেলে মেয়েরাও সারা রাত জেগে থাকে, মোবাইলের সৌজন্যে। প্রথমে ভাবতেন মিনিকে বকবেন, পরে দেখলেন রেজাল্টে এর ফলে খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না, নিজে থেকে আর কিছু বলবেন না ঠিক করে ফেললেন। মেয়ে বড় আদরের। মা যাই বলুক, বাবা কিছু বললেই ঠোঁট ফুলিয়ে ফেলে, আর মেয়ের ঠোঁট ফুললে নিজেরও মন খারাপ হয়ে যায়। মা নেই বলে মেয়েটা দিন দুয়েক সাপের পাঁচ পা দেখেছে, আজ বিকেলে মা চলে এলে তখন নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে, আলাদা করে আর সাময়িকস্বাধীনতাটিকে নষ্ট করে লাভ নেই। ভাইয়ের বউ প্রতিমার কাছে শুনেছেন মেয়ে সারাদিন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছে। মনে মনে হেসেছেন। মেয়েটা বাইরের থেকে ঘরে থাকতেই বেশি পছন্দ করে বরাবর। ঘরকুনো ভীষণ।
কাগজওয়ালা কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে গেল। সোমেন কাগজটা টেবিলে পেতে পড়া শুরু করতে যাবেন এমন সময় দেখলেন জ্যোতির্ময় নিচে নেমে এসেছেন তৈরী হয়ে, হাতে একটা ব্রিফকেস।
সোমেন অবাক হয়ে দাদার দিকে তাকালেন "কীরে, কোথায় যাবি? তাও এত সকালে?"
জ্যোতির্ময় বললেন "আরে তোকে তো বলা হয় নি, আমার বন্ধু জগদীশের মেয়ের বিয়ে কেরালায়। সকালের ফ্লাইটেই বেরিয়ে যেতে হবে"।
সোমেন বললেন "সেকী! কালকেও তো রাতে দেখা হল, কিন্তু তো বললি না"।
জ্যোতির্ময় হাসলেন "ভুলে যাচ্ছি আজকাল। এটাও ভুলে গেছিলাম। কাল রাত সাড়ে এগারোটায় জগদীশ ফোন করে মনে করাল। তারপরেই তো প্যাকিং শুরু করলাম। বৌমাকেও বলা হয় নি"।
সোমেন মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "এত দূর কেরালা, তুই একা একা যাবি? যেতে পারবি? শরীর কেমন আছে তোর?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আরে, অত চিন্তা করতে হবে না। কোলকাতা থেকে অনেকেই যাবে। একটা টিম যাবে ইনফ্যাক্ট, ওদের সঙ্গেই চলে যাব"।
সোমেন বললেন "আর ফিরবি কবে?"
জ্যোতির্ময় বললেন "দেখি। কেরালা ভাল লেগে গেলে দু চারদিন থেকে আসতে পারি। কিন্তু ঠিক নেই তেমন"।
তাপস বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে। তিনিও জ্যোতির্ময়কে দেখে বিস্মিত গলায় বললেন "কীরে দাদা, কোথায় বেরোচ্ছিস?"
জ্যোতির্ময় সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "ছোটকে বলে দিস। আমি বেরলাম এখন। পৌঁছে ফোন করে নেব"।
জ্যোতির্ময় আর কোন দিকে না তাকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাপস আর সোমেন কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তাপস বললেন "কীরে, কোথায় গেল বড়দা?"
সোমেন বললেন "কেরালা। অবিনাশ না কে, তার মেয়ের বিয়ে"।
তাপস অবাক গলায় বললেন "আমায় তো কিছু বলে নি!"
সোমেন বললেন "আমাকেও তো এখনই বলল"।
তাপস চেয়ারে হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বসে বললেন "বড়দার মাথাটা গেছে। কী যে করছে আজকাল কিছুই বুঝতে পারছি না"।
সোমেন বললেন "বাদ দে। ফোন করে খবর নিয়ে নেব। আসলে সারাদিন ঘরে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে গেছে হয়ত"।
তাপস বললেন "তা বটে। কী যে করে সারাদিন ঘরের মধ্যে কে জানে। এত শেয়ার বাজার পাগল লোক, বিয়ে থা করল না। টাকাগুলো নিয়ে কী করবে কে জানে"।
সোমেন হাসলেন "আসলে এগুলো সবটাই নিজেকে কোন একটা কিছুতে এনগেজ রাখার চেষ্টা। ব্যস্ত থাকতে চায় হয়ত। কী করবে, কিছু তো করার নেই। পড়াশুনায় এত ব্রিলিয়ান্ট একটা লোক। চাকরি বাকরি ছেড়ে হঠাৎ করে ঘরে বসে গেল। একটু ছিটিয়াল তো হবেই"।
মিনি উঠে পড়েছিল। বারান্দায় এসে দেখল বাবা আর কাকা বসে আছে। সোমেন অবাক গলায় বললেন "কীরে আজ এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিস? কী ব্যাপার?"
মিনি উস্কো খুসকো চুলে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল "ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম"।
সোমেন তাপসের দিকে তাকালেন "বাড়িটা পাগলের বাড়ি হয়ে যাচ্ছে বুঝলি ছোট? একজন সকাল সকাল কেরল চললেন, আরেকজন, যে কীনা ঘুম ছাড়া একটা মুহূর্ত থাকতে পারে না, সে এত সকালে উঠে বলছে ঘুম আসছে না"।
তাপস আর সোমেন দুজনেই হেসে উঠলেন।

মিনি অবাক গলায় সোমেনের দিকে তাকাল "কে কেরাল গেল বাবা?"
সোমেন বললেন "তোর জেঠু আবার কে? কোন বন্ধুর মেয়ের বিয়ে না কী"!
মিনি বাবার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল "একটু জেঠুর ঘরে চল তো বাবা"।
সোমেন বিস্মিত মুখে মিনির দিকে তাকালেন "কেন?"
তাপস বললেন "তোর আবার কী হল রে মিনি?"
মিনি বাবা কাকা দুজনের হাত ধরেই টানল "আগে চল তারপর বলছি"।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও সোমেন আর তাপস উঠলেন। মিনি রান্নাঘর থেকে জেঠুর ঘরের চাবি নিতে গিয়ে দেখল চাবি নেই।
বাবাকে বলল "বাবা দরজা ভাঙতে হবে"।
সোমেন অবাক চোখে মিনির দিকে তাকালেন "তুই কি পাগল হয়ে গেলি?"
মিনির অস্থির অস্থির লাগছিল। বাবা আর কাকা দুজনেই তার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছেন।
মিনি বলল "জেঠুর ঘরের কোন ডুপ্লিকেট চাবি আছে?"
সোমেন বললেন "কী দরকার আগে সেটা আমাকে বল। এভাবে দরজা ভাঙা যায় নাকি? তুই খেপেছিস?"
প্রতিমা ঘুম চোখে রান্নাঘরে এসে গেছিলেন। সবাইকে দেখে অবাক হয়ে বললেন "কী হচ্ছে এখানে?"
মিনি বলল "তোমাকে জেঠু ঘরের চাবি দিয়ে গেছে কাকিমা?"
কাকিমা বলল "কোথায় যাবে?"
মিনি হতাশ গলায় বলল "জেঠু কেরাল গেছে বলছে। অথচ আমার ঘরটায় ঢোকার দরকার এক্ষুণি"।
সোমেন মেয়ের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। এতক্ষণ হতভম্ব ভাব কাজ করছিল তার মধ্যে। এবার রেগে গেলেন "তুই কী শুরু করেছিস বলবি? নইলে কিন্তু তোর কপালে দুঃখ আছে মিনি"!
মিনি একটা চেয়ারে ক্লান্ত হয়ে হেলান দিয়ে বসে বলল "জেঠু কেমন যেন হয়ে গেছে বাবা"।
সোমেন তাপস মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বললেন "সেটা তো আমরাও জানি, তার জন্য তালা ভাঙার কী দরকার?"
একটু ইতস্তত করে বলল "কিছু না। পরে বলব"।
সোমেন কড়া গলায় বললেন "পরে না। এখনই বলবি তুই। কী হয়েছে?"
মিনি বাবার দিকে তাকিয়ে বলল "বুঝতে পারছি না। কিছু একটা হবে। বা হয়েছে। সাংঘাতিক কিছু একটা"।

২৩।

একটা ঘরে বসতে দেওয়া হয়েছে বীরেনকে। হীমশীতল এসি চলছে। ঘরটা বড় নয়।

মুখোমুখি দুটো চেয়ার রাখা। মাঝে একটা টেবিল। আপাতত বীরেনের সামনের চেয়ারটা ফাঁকা। ঘরে খুব কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। বাকি আলোগুলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে।

আশরফ তাকে বলেছিলেন চুপচাপ তার সঙ্গে যেতে। বীরেন সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। এয়ারপোর্টেই একটা ঘরে ঢোকার তাকে বসতে বলা হয়। একজন এসে তার হাতের ছাপ নিয়ে গেছে ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। আধঘন্টাখানেক বসে থাকার পর ঘরে আশরফ ঢুকলেন। তার সামনের চেয়ারে বসে বললেন "কিছু মনে করবেন না, আপনাকে একটু বসতে হল"।

বীরেন কিছু বলল না।

আশরফ বললেন "আপনার কিছু বলার আছে?"

বীরেন হাসার চেষ্টা করল "বললে আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন?"

আশরফ ঝুঁকে বসলেন "নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। আপনি সায়ক বড়াল, র এর এত বড় একজন এজেন্ট, আপনার কথা বিশ্বাস না করলে কার কথা বিশ্বাস করব বলুন?"

বীরেন বলল "আমার নাম সায়ক বড়াল না"।

আশরফ হাসলেন "সে তো জানি। সায়ক বড়াল আপনি কেন হতে যাবেন, তাকে তো জাস্ট সাত দিন আগেই মুজাফফরাবাদে গুম খুন করা হয়েছে। ওঁর লাশই খুঁজে পাওয়া যায় নি এখনও"।

বীরেন খানিকটা চমকাল।

আশরফ বললেন "মুজাফফরাবাদ জায়গাটা কোথায় জানেন তো? পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। খুব সুন্দর জায়গা। লস্কর থেকে শুরু করে পাকিস্তানের বড় বড় শুয়োরের পালগুলো ওখানে ট্রানজিট ক্যাম্প বানিয়ে থাকে। আপনার তো জানার কথা। আপনি জানেন না? গেছেন কোন দিন?"

বীরেন অসহায়ের মত মাথা ঝাঁকাল "আমি দুদিন ধরে শুধু একজনের নির্দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কলকাতার এক ঠিকানায় এক ভদ্রলোক থাকেন। তিনি আমাকে হুমকি দিয়েছেন তার কথা মত না শুনলে আমার ফ্যামিলিকে মেরে ফেলা হবে। তার পর থেকে এই করে যাচ্ছি"।

আশরফ বীরেনের দিকে তাকালেন "জানি। ডিফেন্স ট্রায়ালের সব ইনফোও আছে ওদের কাছে। আপনাকে আরেকটা ইনফো দি। চাঁদনী চকের হোটেল সেন্টিনেলে

গত রাতে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে। সাতজন নিহত, বারোজনকে হসপিটালাইজড করতে হয়েছে। ক্রিকেট বলের সাইজের একটা বোমা। ওদের নতুন আবিষ্কার"।
বীরেন শিউরে উঠল।
আশরফ পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে বললেন "কিছু বলবেন না?"
বীরেন বলল "আমার ফ্যামিলিকে মেরে ফেলবে ওরা"।
আশরফ বললেন "মারবে না, কারণ এখনও ওরা কিছু বুঝতে পারে নি। আর চিন্তা করবেন না। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি। সাদা পোশাকে গোয়েন্দারা নজর রাখবে আপনার ফ্যামিলির ওপরে। সেরকম কিছু বেচাল দেখতে পাওয়া গেলে স্টেপ নেওয়ার অর্ডার দেওয়া থাকবে"।
বীরেন আশরফের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাল।
আশরফ বললেন "আপনার কথায় আমরা বিশ্বাস করছি। আপনাকে ওদের দেওয়া ফোনটা ব্যাক ওভার করছি। ফোনটা অন করুন"।
বীরেন বলল "আমার হাত বাঁধা"।
আশরফ একটা শিষ দিয়ে বললেন "এ হে হে হে, ভুলেই গেছিলাম। এক মিনিট"।
আশরফ উঠে বীরেনের হাতের দড়িটা খুলে দিলেন। বীরেন নড়ল না। চুপ করেই বসে রইল।
আশরফ পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে অন করলেন।
বললেন "কন্ট্যাক্ট করুন"।
বীরেনের হাত কাঁপছিল। এই ঠান্ডা ঘরেও ঘামে জামাটা জবজব করছিল। আশরফ ধমকালেন "ফোনটা করুন"।
বীরেন কোন মতে জ্যোতির্ময়ের নাম্বারটা রি ডায়াল করল। আশরফকে বলল "ফোনটা সুইচ অফ বলছে"।
আশরফ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট পরে দুজন এসে বীরেনের জামা চেঞ্জ করে দিল।
আশরফ বললেন "আপনার মোবাইলে একটা এস এম এস আছে। সকাল দশটার মধ্যে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সামনে যেতে বলেছে। আপনি বেরিয়ে যান। এখন বেরোলেও সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন। সম্ভবত ওদের ট্যাক্সি থাকার কথা ছিল এয়ারপোর্টে। আপনাকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনি এয়ারপোর্টে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন"।
বীরেন ঘাড় নাড়ল। আশরফ বললেন "আপনাকে ওরা ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছিল। কাশ্মীরে আপনি ব্যাগের মধ্যে করে যে অত্যাধুনিক বস্তুটি নিয়ে গেছিলেন সেটি সম্ভবত এই বিশ্বে প্রথম ব্যবহৃত হল। এয়ারপোর্টের কোন সিকিউরিটি চেকিং

এই সেটা ধরা পড়ে নি। আপনাকে যিনি রিমোট কন্ট্রোল হাতে চালাচ্ছেন, জিনিসটি তারই আবিষ্কার। দিল্লির ছোট্ট রোমটিও। জানি না কীভাবে ওদের কাছে দেশের আধার ইনফরমেশন চলে গেছে, ওরা ছিনিমিনি খেলছে এখন দেশের সিকিউরিটি নিয়ে। সম্ভবত যে ভয়টা আমরা পাচ্ছিলাম, সেটা সত্যি হতে চলেছে। পৃথিবীর সব থেকে বড় জঙ্গি সংগঠন এদেশে তাদের অপারেশন শুরু করে দিয়েছে, the shit is getting real"।

বীরেন বিস্ফারিত চোখে আশরফের দিকে তাকাল।

আশরাফ হাত বাড়ালেন "আমি আশরফ খান, আমার সম্পর্কে পরে জানবেন। আপাতত আপনি একটা দৌড় লাগান, ট্রেন্সি ধরতে হবে যত তাড়াতাড়ি পারেন"।

২৪।

সরু গলিটা দিয়ে অনেকটা হাঁটার পরে জ্যোতির্ময় একটা বাড়ির দরজায় তিনবার নক করলেন।

কুড়ি সেকেন্ডের মাথায় দরজাটা খুলে গেল। জ্যোতির্ময় বাড়ির ভিতর ঢুকলেন। বাড়ি বলতে একটা এক কামরার ঘর, একটা ছোট হল, সঙ্গে রান্নাঘর, অ্যাটাচড বাথ।

ইয়াসমিন দরজাটা বন্ধ করে বললেন "কিছু খাও নি নিশ্চয়ই?"

জ্যোতির্ময় মাথা নাড়লেন।

ইয়াসমিন বললেন "চেঞ্জ করে নাও। খেতে দিচ্ছি"।

জ্যোতির্ময় চেঞ্জ করলেন না। সটান বেডরুমে ঢুকে ডেস্কটপ কম্পিউটারটা অন করলেন।

ইয়াসমিন কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে রান্নাঘরে গেলেন। জ্যোতির্ময় নিষ্পলক চোখে কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কম্পিউটার বুট হল। জ্যোতির্ময় কম্পিউটারে কাজ করা শুরু করলেন।

ইয়াসমিন একটা প্লেটে রুটি তরকারি এনে দিলেন "খেয়ে নাও"। জ্যোতির্ময় প্লেটটা হাতে নিয়ে বললেন "তিন চার দিন এখানেই থাকতে হবে। তার বেশিও থাকতে হতে পারে"।

ইয়াসমিন বললেন "আমি তো সেটাই চাই"।

জ্যোতির্ময় রুটি খেতে খেতে ইয়াসমিনের দিকে তাকালেন "সুমন ফোন করেছিল?"

ইয়াসমিন বললেন "হ্যাঁ। সকালে নাকি চাঁদনি চকে..."

জ্যোতির্ময় বললেন "হু"।

ইয়াসমিন বললেন "ছেলেটাকে এভাবে বাইরে বাইরে রেখে... কাজটা কি ভাল হচ্ছে?"

জ্যোতির্ময় ঠান্ডা গলায় বললেন "নিজেদের লোকেদের জন্য কাজ করলে তার ভাল

খারাপ বিচার করার দায় আমাদের কারও হয় না। উপরওয়ালা আছেন, উনি বিচার করবেন"।

ইয়াসমিন চুপ করে রইলেন।

জ্যোতির্ময় ধীরে ধীরে খাচ্ছিলেন। খাওয়া হয়ে গেলে ইয়াসমিন হাত বাড়িয়ে জ্যোতির্ময়ের থেকে খালি প্লেটটা নিলেন। জ্যোতির্ময় উঠে বেসিনে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে টাওয়ালে হাত মুছে কম্পিউটারের সামনে বসলেন।

ইয়াসমিন প্লেট রান্নাঘরের সিংকে রেখে এলেন।

জ্যোতির্ময় বললেন "তোমার ফোনটা দাও। আমার ফোনটা থেকে এখন ফোন করা যাবে না"।

ইয়াসমিন বললেন "তোমার সামনেই আছে, ওই টেবিলেই"।

জ্যোতির্ময় হাত বাড়িয়ে ইয়াসমিনের ফোনটা নিয়ে ফোন করলেন, একটা নাম্বারে ফোনটা রিং হতেই ওপাশ থেকে একজন ফোন তুলল "বলছি"।

"টার্গেট এসেছে?"

"না। এখনও আসে নি। আধঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি"।

জ্যোতির্ময় ঘড়ির দিকে তাকালেন, দশটা পনেরো বাজে, বললেন "আমি দেখছি, আসবে নিশ্চয়ই। ফ্রেন্ট বারপেট অ্যাবাউট গ্রাইনকোট"।

"এখন বৃষ্টি হচ্ছে না"।

"বৃষ্টির জন্য ওয়েট করতে হবে। ওয়েদার ফোরকাস্ট তো বলছে বৃষ্টি হবে"।

"তা হবে। মেঘ আছে"।

"গুড। রাখছি"।

"খোদা হাফেজ"।

"খোদা হাফেজ"।

ফোনটা কেটে জ্যোতির্ময় বীরেনের ফোনে রিং করলেন। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর বীরেন ধরল "হ্যালো"।

"এখনও পৌঁছওনি?" জ্যোতির্ময় শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

বীরেন বলল "না রাস্তায় আছি, এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে কিছু পাচ্ছিলাম না"।

জ্যোতির্ময় বললেন "ওকে, ট্যাক্সিওয়ালা বাঙালি?"

বীরেন বলল "না। মারাঠি"।

জ্যোতির্ময় বললেন "ওকে। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার কাছেই দেখবে একজন আইসক্রিম বিক্রি করছে, ডান গালে কাটা দাগ আছে। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে"।

ওপাশ থেকে বীরেনের ইতস্তত গলা ভেসে এল "আমার আসলে ঘুম পাচ্ছিল। হোটেলে গেলে..."

জ্যোতির্ময় বললেন "ঘুমাবে ঘুমাবে। সারাজীবনই পড়ে আছে ঘুমাবার জন্য"।

ফোনটা কেটে দিলেন জ্যোতির্ময়। কম্পিউটারটা শাট ডাউন করে বাথরুমে ঢুকলেন। আধঘন্টা পর বাথরুম থেকে চেঞ্জ করে বেরোলেন। একটা নীল টিশার্ট আর একটা থ্রি কোয়ার্টার পরে।

ইয়াসমিনকে বললেন "ঠিক আধঘন্টা পর আমায় ডেকে দিও। এখন ঘুমাব"। ইয়াসমিন ঘাড় নেড়ে আলো নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আধঘন্টা পরে দরজা খুলে আলো জ্বাললেন।

জ্যোতির্ময় ঘুমাচ্ছিলেন। ইয়াসমিন ডাকলেন। জ্যোতির্ময় উঠে ইয়াসমিনের ফোনটা নিয়ে বীরেনকে ফোন করলেন, বীরেন ধরল "হ্যাঁ বলছি"।

"কোথায় তুমি?"

"এই তো লোকাল ট্রেনে উঠেছি। কাল বাস্তায় নেমে ধারাভিতে পৌঁছতে"।

"বৃষ্টি হচ্ছে?"

"না"।

জ্যোতির্ময় শ্বাস ছাড়লেন একটা।

"ঠিক আছে। ধারাভিতে পৌঁছে যেভাবে কথা আছে সেভাবে কাজটা করে এয়ারপোর্ট ফিরে এসো"।

"আচ্ছা। আমি আজকেই বাড়ি ফিরতে পারব তো?"

"পারবে"।

"রাখছি"।

"খোদা... রাখো"।

২৫।

সোমেন অবাক হয়ে মিনির দিকে তাকিয়ে বললেন "তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে"। মিনি রান্নাঘরে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। মিটশেফের ওপরে একটা হাতুড়ি ছিল। মিনি সেটা হাতে নিল।

তাপস সোমেন প্রতিমা তিনজনেই হা হা করে উঠলেন। সোমেন বললেন "কী শুরু করেছিস?"

মিনি হাঁফাচ্ছিল "জেঠুর ঘরের তালা ভাংতে হবে বাবা"।

সোমেন তাপসকে বললেন "কী শুরু করল বলত মেয়েটা? বড়দা যদি জানতে পারে বুঝতে পারছিস কী হবে?"

তাপস মিনির বেপরোয়া চেহারাটা দেখে বললেন "শোন দাদা, আমার মনে হয় মিনি কিছু একটা আঁচ করেছে। ও যখন বলছে তখন তালা ভাঙি। পরে কিছু একটা বলে ম্যানেজ দেওয়া যাবে"।

প্রতিমা সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "হ্যাঁ মেজদা, তাই করি। মিনি যা বলছে তাই শুনি"।

সোমেন এগিয়ে গিয়ে মিনির হাতের হাতুড়িটা নিয়ে বললেন "চ তবে"। মিনির উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সবাই মিলে দোতলায় উঠলেন। তালাটা বেশ শক্ত পোক্ত তালা। হাতুড়ি দিয়ে বেশ কয়েকবার বাড়ি মেরে তারপরে ভাঙা গেল।

মিনি হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকল। সোমেন বিরক্ত গলায় বললেন "আহ মিনি, এত তাড়াহুড়োর কী হল?" ঘরের জানলা বন্ধ ছিল। মিনি আলো জ্বালল। ঘর যেমন থাকে তেমনই আছে।

প্রতিমা চারদিকে তাকিয়ে বললেন "একই রকম তো আছে রে মা। কিচ্ছুই তো পালটায় নি"।

তাপস ঘরের চারদিকে একবার দেখে নিয়ে মিনিকে বললেন "কীরে পাগলী। এবার খুশি?"

মিনি খাটের ওপর বসে পড়ল। জোরে জোরে শ্বাস ছাড়তে লাগল।

সোমেন মিনির মাথায় হাত দিয়ে বললেন "আমাকে বলবি কী হয়েছে? আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই এরকম পাগলের মত করছিস কেন?"

মিনি তোষকটা তুলল। লিফলেটটা নেই। ফিসফিস করে বলল "জানতাম"।

সোমেন এবার ধমক দিলেন "আমায় বলবি কী হয়েছে?"

মিনি বাবার দিকে তাকিয়ে বলল "বাবা, শোন, এ খাটের তোষকের তলায় আমি একটা লিফলেট পেয়েছিলাম। লিফলেটটা আরবী ভাষায় লেখা"।

তাপস অবাক গলায় বললেন "তুই আবার আরবী শিখলি কবে?" প্রতিমাও অবাক হলেন "তুই যে সেদিন আমাকে বললি কীসের যেন একটা অ্যাড?"

মিনি বলল "আমি শিওর ছিলাম না। তাছাড়া হতেই পারে ওরকম লিফলেট কোন কাগজের সঙ্গে বা জেঠু কিছু কিনেছিল তার সঙ্গে দিয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলাম জেঠু লিফলেটটা ওষুধের বাক্সে না রেখে তোষকের তলায় লুকিয়েছিল তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। লিফলেটটা কী এমন মহার্ঘ্য জিনিস যে তোষকের তলায় লুকোতে হবে? আমি আমার এক বন্ধু আছে যে আরবী জানে, তাকে লিফলেটটা পাঠিয়েছিলাম, সে জানাল লিফলেটটায় নাকি কী সব স্বাধীনতার যুদ্ধ টুদ্ধ লেখা আছে। পকিস্তান জিন্দাবাদ, কাশ্মীর কী আজাদি এসবও লেখা!"

সোমেন, প্রতিমা, তাপস সবাই চোখ বড় বড় করে মিনির কথা শুনছিলেন। বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর তাপস বললেন "ভাইঝিটা মনে হয় পাগল হয়ে গেছেরে মেজদা"।

মিনি বলল "পাগল হয়ে গেছি? দাঁড়াও। এক্ষুণি আসছি"।

মিনি জোরে জোরে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সোমেন তখনও বিস্মিত মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাপস বললেন "কী রে দাদা কিছু বল"।

সোমেন একটু ইতস্তত করে বললেন "তুমি একটু নিচে যাও বউমা। তাপসকে একটা কথা বলার আছে"।

প্রতিমা কয়েক সেকেন্ড সোমেনের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরোলেন।

তাপস বললেন "কীরে, কী হল?"

সোমেন বললেন "তোকে একটা কথা বলি ছোটু। আমি কাউকে বলি নি কথাটা। বছর তিনেক আগের কথা। আমি অফিসের কাজে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে গেছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল বড়দা এক বোরখা পরা মহিলাকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। ভীষণ অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু ডাকিনি। ভেবেছিলাম বেশি বয়সের প্রেম হয়ত। পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে কী করছিলি। আমাকে পুরো অবাক করে দিয়ে বড়দা বলেছিল কী যে বলিস, আমি তো আজকে কলেজ স্ট্রীট গেছিলাম। কাকে দেখতে না কাকে দেখেছিস। আমিও ভেবেছিলাম তাই হবে হয়ত, কিন্তু এও মনে হচ্ছিল এতটা ভুল দেখলাম?..."

সোমেনের কথার ফাঁকেই মিনি ঘরের ভিতরে ঢুকল। হাতে মোবাইল। সোমেনের হাতে গ্যালারি থেকে ছবিটা বের করে দিয়ে বলল "দেখো, এ দেখো সেই লিফলেট আমি ফটো তুলে রেখেছিলাম"।

তাপস একটা চেয়ার টেনে বসলেন। সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমি তো কিছুই..."

সোমেন মোবাইলটা খাটের ওপর রেখে মিনির দিকে তাকিয়ে বললেন "তুই কী করতে চাইছিস?"

মিনি বলল "ঘরটা সার্চ করব ভালো করে"।

সোমেন বললেন "কর, তোর কাকিমাকেও ডেকে নে"।

মিনি কাকিমাকে ডেকে পাগলের মত ঘর সার্চ করা শুরু করল, খাটের তলা, ওয়ার্ড্রোব, ওষুধের বাক্স। কয়েক মিনিট পর সোমেন এবং তাপসও হাত লাগালেন।

প্রতিমা বললেন "কী হচ্ছে জানতে পারি কিছু?"

মিনি অস্থির গলায় বলল "খোঁজ প্লিজ, লিফলেট থেকে শুরু করে যা যা চোখে পড়ে বের করে এই খাটের ওপরে রাখো"।

সবাই মিলে বেশ খানিকক্ষণ খুঁজল। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। তাপস চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে হতাশ গলায় বলল "তোর নির্ঘাত পাওয়ার বেড়েছিল মেজদা। কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস"।

সোমেন হতাশ হয়ে বললেন "তাই হবে মনে হচ্ছে। বড়দাই ঠিক হবে"। মিনি মেঝের ওপর বসে পড়ল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল "কিছু নেই!!! হতে পারে!!!"

সোমেন বললেন "শোন, তোর চোখের ভুল আসলে সবটাই। কী দেখতে কী দেখেছিস!"

তাপস বললেন "আমি ভাবছি প্রতিমার কাজ বেড়ে গেল। ঘরটা আবার আগের মত করে রাখতে হবে..."

প্রতিমা বললেন "তার আগে ভাবো যে তালা ভাঙলে তার কী সদুত্তর দেবে"। মিনির চোখ পড়ল জ্যোতির্ময়ের বুক শেলফে। সে মেঝে থেকে উঠে বুক শেলফটা খুলল।

প্রতিমা বললেন "হয়ে গেল। আমাদের সবার। দাদার সাধের বুক শেলফ..."

মিনি সব বই একটার পর একটা মেঝেতে নামাতে থাকল। প্রতিটা বই খুলে খুলে দেখতে লাগল।

তাপস বললেন "কী দেখছিস?"

বেশ কয়েকটা বই ঘেঁটেঘুটে দেখার পরে অবশেষে মিনি লাফিয়ে উঠল। সবাই হাঁ করে মিনির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

২৬।

বীরেন বুঝতে পারছিল না তার টেনশন করা উচিত হবে কী না। এয়ারপোর্টে আশরাফ খানের সঙ্গে দেখা না হলে হয়ত সে টেনশন করত না। সে স্পষ্টতই বুঝতে পারছে সে কোন একটা গভীর জালে জড়িয়ে পড়ছে কিন্তু মানসিকভাবে সে সব কিছুর উপরে চলে যাচ্ছিল। যতবার তার মনে পড়ছিল কাশ্মীরে কিংবা দিল্লিতে তার জন্য এতগুলো মানুষের প্রাণ চলে গেছে ততবারই নিজের প্রতি ঘেন্না হচ্ছিল। জেনেই হোক কিংবা অজান্তে, আদতে সে তো তার নিজের দেশেরই কয়েকজন নাগরিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়ে থাকল। বার বার মনে হচ্ছে কী কুক্ষণেই সে এটিএম থেকে টাকাটা তুলতে গেছিল। নাকি ওখানে না হলেও ওরা কোন না কোন ভাবে ঠিকই তুলে নিত? কে জানে! ধারাভি বস্তির মধ্যে অনেকটা হাঁটিয়ে তাকে একটা ঘরে বিশ্রাম করতে বলে একজন চলে গেছে। ঘরটায় কোন ফার্নিচার নেই। দেওয়ালে কোন ছবি নেই। লোকটা হিন্দিতেই কথা বলছিল। একজন মহিলা এসে তিনটে রুটি আর দু পিস মাংস দিয়ে গেছিল। বীরেন সেটাই খেয়ে মেঝেতে পেতে রাখা মাদুরে শুয়ে ছিল। মোবাইলে বাড়ি থেকে বাবা ফোন করেছিল। দিল্লির ঘটনা শুনে স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন।

বীরেন বলে দিয়েছে সে চাঁদনী চকের থেকে অনেক দূরে আছে। চিন্তা করার মত কিছু হয় নি। শুনে বাবা খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছে।

বীরেনের কষ্ট হচ্ছিল বাবার সঙ্গে কথাগুলো বলার সময়। এভাবে পরপর মিথ্যে কথা সে কোন দিন বলে নি।

দুপুর একটা নাগাদ তার দরজায় কেউ একজন নক করল। বীরেন উঠে দরজাটা খুলল।

যার সঙ্গে বীরেনের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ায় দেখা হয়েছিল, সে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করল। হাঁপাচ্ছিল সে।

বীরেন বলল "কী হল?"

লোকটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে মেঝেতে বসে বলল "কিছু হয় নি। আপনি বসুন"।

বীরেন খানিকটা অধৈর্য হয়েই বলল "আমার তো আজকে ফেরার কথা। উনি বলেছিলেন আমাকে"।

লোকটা বিরক্ত গলায় বলল "বসুন না। এত তাড়া কীসের?"

বীরেন বলল "তাড়া হবে না? দু দিন ধরে পাগলের মত এ জায়গা সে জায়গা করে যাচ্ছি, আপনি আমার জায়গায় থাকলে কী করতেন"।

লোকটা এবার সুর নরম করল "আচ্ছা, বসুন আমি ব্যবস্থা করছি। আমার নাম আসলাম। আপনাকে বোধ হয় বলা হয় নি"।

বীরেন বসল।

আসলাম বলল "খেয়েছেন?"

বীরেন বলল "হ্যাঁ"।

আসলাম বলল "কয়েক জন গেস্ট এসেছিল। আজ চলে যাবে। ওদের ছাড়তে দেরী হয়ে গেল একটু"।

বীরেন কোন প্রশ্ন করল না।

আসলাম ফোনটা বের করে অজানা ভাষায় বেশ কয়েকটা ফোন করল। মিনিট পনেরো পরে তাকে বলল "আপনার জন্য সুখবর আছে। এখন আর বেশি কোন কাজ নেই। এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে একটু আগে, রেইনকোটটা পরে নিন, খানিকটা হেঁটে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড পাবেন। ওয়ান টু থ্রি জিরো নাম্বারের ট্যাক্সিতে উঠে এয়ারপোর্ট চলে যাবেন। ভাড়া দিতে হবে না। ট্যাক্সিওয়ালা আপনাকে কলকাতার টিকেট দিয়ে দেবে"।

বীরেন বলল "আমি বেরিয়ে যাব?"

আসলাম বলল "হ্যাঁ, বেরিয়ে যান, রেইনকোটটা পরে নিন"।

বীরেন উঠল। ব্যাগ থেকে রেইনকোটটা পরল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ব্যাগটা হাতে নিল।

আসলাম বলল "খোদা হাফেজ"।

বীরেন বলল "এলাম"।

দরজাটা খুলে বীরেন জোরে পা চালাল।

এরকম বস্তি সে কোন দিন দেখে নি। রাস্তা কোথাও কোথাও অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। বস্তিটাই রাস্তায় নেমে এসেছে বলা চলে। রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নোংরা খাল। পচা গন্ধ ভেসে আসছে কোথেকে। এরকম একটা জায়গায় মানুষ থাকে কী করে ভেবে পাচ্ছিল না সে।

বেশ জোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। রেইনকোটটা না থাকলে সত্যিই ভিজে যেত সে। মনে মনে আসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল বীরেন। অনেকটা রাস্তা হেঁটে আসলামের নির্দেশমত ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছল সে। চারটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বীরেন দেখল ওয়ান টু থ্রি জিরো নম্বর ট্যাক্সিটাই সবার আগে দাঁড়িয়ে।

বীরেন তড়িঘড়ি ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

ট্যাক্সিচালক ভাবলেশহীন মুখে ট্যাক্সি স্টার্ট দিল।

বীরেন কাঁচ তুলে দিল। বৃষ্টির ছাট গাড়ির ভেতরে আসছে।

খানিকক্ষণ পরে দেখল ঘাম লাগছে। রেইনকোটটা খুলল।

বস্তি অঞ্চল পেরিয়ে ট্যাক্সিটা এগোচ্ছে। বীরেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে ট্যাক্সিতে হেলান দিল। বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পর ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সিটা রাস্তার বাঁ দিকে দাঁড় করাল।

বীরেন বলল "কী হল?"

ট্যাক্সিচালক উত্তর না দিয়ে নেমে গেল।

২৭।

"নৈরাজ্য। শব্দটার মধ্যে একটা মাদকতা আছে। একটা অন্যরকম নেশা আছে। নেই রাজা, নেই শাসন, নেই কারও ভয়।

রাজা যখন মাথায় চড়ে বসে, তখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকতে ঠেকতে একটা সময় প্রজাকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। এই নিজের সব কিছু ক্ষমতা কিংবা টাকার বিনিময়ে বিকিয়ে দেওয়ার সময়ে দাঁড়িয়ে একজন এমন কাউকে দরকার হয়, যাকে রুখে দাঁড়াতেই হবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস বলে এ নৈরাজ্য একটা সময়ে চেয়েছিলেন দেশের তরুণ তুর্কী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। তারা চেয়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে,

ব্রিটিশদের সঙ্গে সরাসরি অস্ত্রের লড়াইয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস বলে সময় যত অগ্রগতি হয়েছে পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোতে নৈরাজ্য তত কমেছে। কিন্তু সভ্য বলতে আমরা কী বুঝি, সভ্যতার ডেফিনিশনই বা কী? একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নৈরাজ্য এসেছে, এসেছে আই এস আই এসের মত সংগঠন। বলা বাহুল্য, এ নৈরাজ্য মোটেও সুখকর হয় নি। জেহাদ আসলে কী, কিন্তু অন্ধ ধর্মবিশ্বাসী আসলে কোন জেহাদের কথা বলে, তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক বারোবারেই চলেছে। কিন্তু যত এ বিষয়ের গভীরে যাওয়া যাবে, তত বোঝা যাবে, এই জেহাদের নামে কিন্তু একশ্রেণী আসলে সেই নৈরাজ্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

আরও গভীরে গেলে জানা যাবে, এই জেহাদী সংগঠনগুলো স্থাপন করার মূল অর্থ জোগান দিয়েছিল উন্নত বিশ্বের দেশগুলিই। আফ্রিকার সোমালিয়ার মত দেশে যেখানে কোন আইন নেই, শাসন নেই, আছে শুধু নৈরাজ্যের পর নৈরাজ্য, সেখানে জীবন কেমন? সেদেশে কোনটা আগে এসেছে? জেহাদ না নৈরাজ্য?

আই এস আই এস কিংবা তালিবানেরাই বা জেহাদের নামে কী প্রতিষ্ঠা করেছে? এরা আসলে ধর্মের নামে ব্যবহার করেছে নিজেদের পুরুষতান্ত্রিকতাকে।

যে পুরুষতন্ত্র অবলীলায় প্রত্যাখ্যান করবে নারীর স্বাধীনতাকে, যে পুরুষতন্ত্র বলে দেবে, না, নারী, তোমার পোশাকে তোমার চোখ ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না, কিন্তু সেই নারীই আসলে আর কিছুই না, শুধুমাত্র একটি যোনিমাত্র, যার জন্ম হয়েছে পুরুষকে আনন্দ দেবার জন্য, যে সংগঠনগুলো আসলে বলে জেহাদের কথা, কিন্তু তাদের লক্ষ্য নৈরাজ্য। কেমন নৈরাজ্য?

যে নৈরাজ্য নারীকে দেবে না শিক্ষার অধিকার, যে নৈরাজ্য নারীকে দাসী ছাড়া আর কিছু ভাববে না, সে নৈরাজ্য কি আদৌ সুখকর হতে পারে? শুধু ইসলামি সংগঠনই বা কেন, আমরা চোখ ঘুরাতে পারি প্রাচীন দেবদাসী কিংবা দান করে রাখার প্রথাগুলোর দিকেও। মানুষের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে যেখানে মেয়েদের মানুষ ভাবা হয় নি।

কোন সমাজ যদি তার অর্ধেক প্রতিনিধিকে যোনির বাইরে কিছু ভাবতে না পারে, ভোগ্যপণ্য ছাড়া আর কিছু ভাবতে না পারে, তবে সে সমাজ কি খুব সুখকর সমাজ হতে পারে? এই এগিয়ে যাওয়ার সময়ে আমরা কী করে পিছনের দিকে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি?

ভারতেরই কোন কোন রাজ্য আছে যেখানে কন্যাসন্তান আসবে শুনেই ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। সেসব রাজ্যে কি আদৌ কোন গণতন্ত্র আছে বলে আপনাদের মনে হয়?

আমাদের বুঝতে হবে, নৈরাজ্য কখনই কোন কিছুর সমাধান হয় না। হতে পারে না। জিহাদের নামে এই সমস্ত নৈরাজ্যের আমাদের বিরোধিতা করতে হবে। নইলে বাকি বিশ্ব আমাদের যে দৃষ্টিতে দেখছে, সেই দৃষ্টিকে আমরা কোনদিন পরিবর্তন করতে পারব না"।

ইউটিউবে আফসানা সাইদের বক্তব্য হেডফোনে শুনছিলেন জ্যোতির্ময়। ইয়াসমিন ঘুমিয়েছে দুপুরে খাওয়ার পরে। তিন চারবার বক্তব্যগুলি বার বার প্রথম থেকে শুনে গেলেন জ্যোতির্ময়।

খানিকক্ষণ পরে ইউটিউব বন্ধ করে স্যাটেলাইট ফোনে একটা নাম্বার ডায়াল করলেন। একবার রিঙয়েই ওপাশ থেকে কেউ একজন ফোন তুলল। জ্যোতির্ময় একটা কোড শব্দ বললেন। কয়েক মিনিট পরে একজন বললেন "সালাম। আপনার প্রোগ্রাম ফিক্সড?"

"হ্যাঁ জনাব। আফসানা সাইদ আজ সন্ধ্যে ছটা কুড়ির কলকাতা ফ্লাইটে উঠছেন"।

"কাজ হলে জানাবেন। রাখছি"।

"ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে গেল"।

জ্যোতির্ময় ইয়াসমিনের দিকে তাকালেন। ইয়াসমিনকে কি তিনি শুধু যোনি হিসেবেই দেখেছেন? তাহলে তার সন্তানের মা হলেন কীভাবে ইয়াসমিন? কীভাবেই বা সবার অলক্ষ্যে নিজের সংসার সযত্নে পালন করে এসেছেন, যাতে সমাজ না মানে, নিরুদ্ধাচরণ না করে, তার জন্যেই তো ইয়াসমিনকে এভাবে আলাদা রেখেছেন। একজন এসে, বুদ্ধিজীবি সেজে যা ইচ্ছা তাই বলবে, আর তাই মেনে নিতে হবে?

জ্যোতির্ময় নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। একটা সুরা মনে করার চেষ্টা করছেন কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে পায়চারি শুরু করলেন। নিজের মনেই পায়চারি করছিলেন সম্বিত ফিরল দরজায় টোকার শব্দে। হালকা শব্দেই টোকা দিচ্ছে কেউ। ইয়াসমিনের ঘুম ভেঙে গেল এই শব্দেই। বললেন "দরজাটা খুলে দাও, মনে হয় দুধ দিতে এসেছে"।

জ্যোতির্ময় হেঁটে গিয়ে দরজাটা খুললেন এবং খুলেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। দরজার বাইরে সোমেন, তাপস এবং মিনি দাঁড়িয়ে!

২৮।

বিকেল চারটে নাগাদ বীরেন এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগল। গত এক ঘন্টা ধরে যা হল তা সে কোনদিন ভুলতে পারবে না। ট্যাক্সিচালক তাকে গাড়ির ভেতর বসিয়ে বাইরে গেছিল বৃষ্টির মধ্যেই। বীরেন জানলার কাঁচ খুলে চেঁচাল কী হয়েছে জানার জন্য। ট্যাক্সিচালক বলল জল কিনতে যাচ্ছে। রাস্তা পেরোতে যাচ্ছিল লোকটা, একটা গাড়ি এসে সরাসরি ধাক্কা মারল

লোকটাকে। ছিটকে গিয়ে দেহটা একটা ল্যাম্পপোস্টে লেগে সেখানেই স্থির হয়ে গেল। ঘটনাটা এতটাই আকস্মিকভাবে ঘটল যে আতঙ্কে বীরেনের চোখ দুটো বেরিয়ে আসছিল।

লোক জমে ওঠার আগেই একটা অন্টো গাড়ি এসে দাঁড়াল তার ট্যাক্সির পাশে।

বীরেন হতচকিত হয়ে তাকাল সেদিকে। গাড়ির চালক কাঁচ নামিয়ে বলল "খান সাব নে ভেজা হে। জলদি চলিয়ে"।

বীরেন ব্যাগটা নিয়েই গাড়িতে উঠে পড়ল। বাকি রাস্তায় অনেক প্রশ্ন করলেও গাড়ির চালক তার সঙ্গে একটা কথাও বলল না। বীরেনকে এয়ারপোর্টের সামনে নামিয়ে দিয়ে হাতে একটা টিকিট ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।
বীরেনের ঘোর কাটছিল না। কোনমতে এয়ারপোর্টের ভেতরে গিয়ে বোর্ডিং পাশ নিয়ে বসল। মিনিট পাঁচেক পরে তার শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। সে বুঝে উঠতে পারছিল না ট্যাক্সিচালককে কি ইচ্ছা করে মারা হল না আদতে ওটা অ্যাক্সিডেন্টই ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর সে বুঝল তাকে টয়লেটে যেতে হবে। সে উঠে টয়লেটে গেল। টয়লেট সেরে বসার জায়গায় ফিরে দেখল তার পাশের চেয়ারে খান বসে আছেন। তাকে দেখে তাকালেন।

বীরেন বিস্মিত গলায় বললেন "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার, কী হল একটু বলবেন?"

খান মাথা নিচু করে বেশ কয়েক সেকেন্ড কপালে হাত দিয়ে বললেন "ট্যাক্সির ডিকিতে যে বোমটা ছিল তাতে একটা ছোট খাট বাজার উড়ে যেতে পারে। যে ভারি রেইনকোটটা তোমাকে পরতে দিয়েছিল ওটা পরে তোমার কোন কষ্ট হয় নি"?
বীরেন মাথা নাড়ল "না তো?তবে তখন এমন তাড়াহুড়ো ছিল, আমি আর কিছু ভাবতেও পারি নি, ওরা যা যা বলেছে, সেই মতই করে গেছি।"

খান হাসলেন "জিম কর তুমি?"

বীরেন বলল "কেন বলুন তো?"

খান বললেন "রেইনকোটের দুটো লেয়ার ছিল। পিঠের দিকটায় এমন ভাবে একটা সার্কিট রাখা ছিল..." বলতে বলতে খান মাথা নাড়লেন "দে আর জিনিয়াস"।
বীরেন হাঁ করে তাকাল খানের দিকে, "মানে?"
খান উঠলেন "মানে কিছুই না। ওরা আরেকটা অফিশ এগারো প্ল্যান করেছিল আর কী! শহরে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। যদি এ শহরে ওদের কেউ থেকেও থাকে, আজ পালিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। যাক গে, তোমার এখন বোধ হয় বাড়ি ফেরাটা জরুরি। তুমি আমার সঙ্গে চল"।

বীরেন উঠল। খান হাঁটতে হাঁটতে বললেন "আমি জানি না এর পরে ওদের কী প্ল্যান আছে, তুমি তোমার শহরে পৌঁছে সাবধানে থেকো। তোমাকে দিল্লি আসতে হতে পারে, ফোন করলে দেরী কোর না একটুও"।

বীরেন বলল "স্যার, আমি দিল্লি গিয়ে কী করব?"

খান হাসলেন "এত কিছু হল, তোমার বয়ানটা দিতে হবে তো। তবে তোমাকে অন্তত তিন দিন আমরা বিশ্রাম দেব"।

বীরেন থমকে দাঁড়াল "স্যার ভয়ের কিছু নেই তো?"

খান বীরেনের কাঁধে হাত দিলেন "তুমি এখনও ভয় পাও নাকি? গত দুদিনে তুমি ঠিক কী কী করেছ সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে?"

বীরেন বলল "কিন্তু জ্যোতির্ময়বাবু?"

খান বললেন "সে সব ভাবনা তোমায় আর ভাবতে হবে না। আপাতত আমাদের লাউঞ্জে বিশ্রাম কর"।

এয়ারপোর্টের ভেতরে অনেকটা হাঁটিয়ে আলাদা একটা লাউঞ্জে বীরেনকে নিয়ে প্রবেশ করলেন খান। বেশ কয়েকজন কম্যান্ডো খানকে দেখেই স্যালুট দিলেন। খান ওদের স্যালুট ফিরিয়ে দিয়ে বললেন "চিন্তা কোর না, এরা তোমার জন্য নেই। ওর জন্য আছেন"।

খানের কথা শেষ হতেই বীরেনের নজর পড়ল ভদ্রমহিলার দিকে। চেনা চেনা লাগছিল, মনে হচ্ছিল আগে কোথাও দেখেছে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিল না।

খান বললেন "চিনতে পারলে না তো? ওর নাম আফসানা সাইদ। পাকিস্তানি লেখিকা, সমাজকর্মী। আপাতত লস্কর ওর মাথার দাম রেখেছে কয়েক কোটি টাকা। তোমার সঙ্গেই কলকাতা যাচ্ছেন"।

বীরেন নমস্কার করলেন। খান বীরেনকে দেখিয়ে আফসানাকে বললেন "হি ইজ আ সারভাইভার ম্যাম"।

আফসানা হাসলেন "রিয়েলি?"

খান সংক্ষেপে আফসানাকে বীরেনের সঙ্গে যা যা হয়েছে বললেন। আফসানা গভীর দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "দ্য ওয়ার উইল নেভার এন্ড খান... নেভার এন্ড"...

২৯।

জ্যোতির্ময় কয়েকসেকেন্ড সোমেনদের দিকে তাকিয়ে দরজা ছেড়ে বললেন "ভিতরে আয়"।

সোমেন অবাক গলায় বললেন "এসব কী?"

জ্যোতির্ময় ঠান্ডা গলায় বললেন "ভেতরে আসবি নাকি তোদের ব্রাহ্মণ জাত্যভিমানে ঘা লাগবে? জাত যাবে? এক কাজ করতে পারিস, বাড়ি ঢোকার আগে গঙ্গা স্নান সেরে মুখে গোবর ছুঁইয়ে না হয় বাড়ি ঢুকবি, তাহলে তো হবে?"

সোমেন ঘরের ভিতর ঢুকে বললেন "তোর কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি, মানে আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না!অফিস পর্যন্ত গেলাম না আজ, এখানে না এলে তো কিছুতেই কিছু বিশ্বাস হচ্ছিল না!"

জ্যোতির্ময় মিনির দিকে তাকালেন "তুই ধরেছিস না সবটা?"

মিনি আমতা আমতা করল "হ্যাঁ, মানে..."

জ্যোতির্ময় হাসলেন "খানিকটা আন্দাজ করেছিলাম। ভেতরে আয়"।

মিনিরা ভেতরে গেল। মিনি কৌতূহলভরে বাড়িটা দেখতে লাগল। দেওয়ালে বাবা শরীফের ছবি। ঘরের মেঝেতে যত্ন করে কোরাণ রাখা একটা কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর, মিনি সেদিকে তাকিয়ে আছে দেখে জ্যোতির্ময় বললেন "ওই জিনিসটাকে রেহাল বলে। তোরা আয় আমি ইয়াসমিনকে ডেকে দি"।

জ্যোতির্ময় ঘরের ভিতরে গিয়ে ইয়াসমিনকে ডাকলেন। ইয়াসমিন ঘুম থেকে তড়িঘড়ি উঠলেন।

জ্যোতির্ময় সোমেন এবং তাপসকে বললেন "তোদের বৌদি। তোরা খাটের ওপরেই বোস, মিনি তুই চেয়ারটা নিয়ে বোস। চা খাবি তো? নাকি জাত যাবে?"

সোমেন ভ্যাবাচ্যাকা মুখে কিছুক্ষণ চারদিকে তাকিয়ে বললেন "খা... খাব"।

ইয়াসমিন রান্নাঘরের গেলেন।

তাপস বললেন "কী... বড়দা... আমি তো..."

জ্যোতির্ময় বললেন "আমার ছেলে আছে। মিনির থেকে বছর পাঁচেকের বড়"।

সোমেন তাপস চাওয়া চাওয়ি করলেন।

মিনি জেঠুর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল। এই জেঠুকে সে চেনে না। এই লোকটা দোতলার ঘরে সারাদিন শেয়ার মার্কেট নিয়ে চর্চা করা, ন্যালাখ্যাপা, সারাজীবন বিয়ে না করা লোকটা না। এই লোকটা অনেক আত্মপ্রত্যয়ী, সংসারী একটা লোক, আরও কিছু আছে জেঠুর চোখের মধ্যে যেটা মিনি পড়তে পারছে না, বা পড়তে ভয় পাচ্ছে।

সোমেন একটু গলা খাকড়িয়ে বললেন "একটা বইয়ের ভেতরে এই বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিল মিনি, আমি তো বিশ্বাসই করছিলাম না..."

জ্যোতির্ময় মিনির দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন "আমার ঘর তল্লাশি হয়েছে তবে? কী দেখে সন্দেহ করেছিলি? ওহ... আমারই বোঝা উচিত ছিল আগেই। আমিই ভুল। লিফলেটটা, তাই তো?"

মিনি মাথা নিচু করল। তার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে আসছিল।

সোমেন বললেন "তোর ছেলে... কোথায় দাদা?"

জ্যোতির্ময় বললেন "কাজে গেছে"।

তাপস জানতে চাইলেন "কোথায়? কলকাতাতেই থাকে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "না",বলেই কথাটা ঘোরালেন জ্যোতির্ময় "মা জানত ইয়াসমিনের কথা। শেষের দিকে বলেছিলাম। মানতে পারে নি"।

ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা সৃষ্টি হল।

কয়েক সেকেন্ড পরে জ্যোতির্ময় বললেন "এই যে আমাদের চারপাশটা দেখছিস না, একটা অদ্ভুত মিথ্যা দিয়ে তৈরী হয়েছে। অদ্ভুত মিথ্যা। দুটো ধর্ম পাশাপাশি আছে, অথচ একে অপরকে কী তীব্র ঘৃণাই না করে! মা, আমার গর্ভধারিণী মা, আমাকে ত্যাগ করে দিল শুধু আমি একজন অন্য ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করেছি বলে? নিজের ছেলের থেকে তার একটা ধর্ম বড় হয়ে গেল?"

সোমেন বললেন "আমাদের বলতে পারতি দাদা, আমরা তো..."

জ্যোতির্ময় জ্বলন্ত চোখে সোমেনের দিকে তাকালেন "ভট্টাচার্যবাড়িতে মুসলিম বউ নিয়ে ঢুকব? স্বাভাবিক ঠেকত ব্যাপারটা? কোন কালে স্বাভাবিক ঠেকত বল শুনি? কথায় কথায় কমিউনিজমের বুলি ওড়াত যে বাঙালি, তাদের মধ্যেই তো সব থেকে বেশি কমিউনালিজমের বীজ বোনা আছে। কেন বুঝতে পারিস না আজকাল? রাস্তা ঘাটে যে হারে দেব দেবী বাড়ছে, যে হারে মাথায় ফেজটুপি দেখলে উত্তেজনা বাড়ছে, এগুলো স্বাভাবিক মনে হয় তোদের? বুকে হাত দিয়ে বল তো, ট্রেনে তোর পাশের মুসলিম ফ্যামিলিটা টিফিনকারিতে মাংস নিয়ে এলে তুই ভয় পাস না?
পাস কি না বল!"

সোমেন মরিয়া হয়ে বললেন "কিন্তু দাদা, সেটা আমরা বুঝতাম, কে কী বলত আমরা বুঝতাম। তুই এত বড় একটা সিদ্ধান্ত আমাদের থেকে লুকিয়ে, কেন..."

ইয়াসমিনের ফোনটা বেজে উঠল। জ্যোতির্ময় ফোনটা নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ইয়াসমিন একটা ট্রেতে তিন কাপ চা আর বেশ কিছু বিসকুট এনে খাটের ওপর রাখলেন।

সোমেন একটু ইতস্তত করে বললেন "বউদি, কিছু মনে করবেন না, দাদা তো কোনদিন পরিচয় করায় নি..."

ইয়াসমিন সোমেনের কথার উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সোমেন তাপসের দিকে তাকালেন, "কীরে! কী করবি?"

তাপস বললেন "শোন মেজদা, আমরা বেরিয়ে যাই। আমার কেন জানি না, সবটা ঠিক স্বাভাবিক লাগছে না"।

মিনি গলা নামিয়ে বলল "কম্পিউটারটা অন করতে পারলে ভাল হত বাবা"। তাপস চাপা গলায় ধমকালেন মিনিকে "ভাবতেও যাস না এসব। বুঝতে পারছিস

না বড়দা কেমন একটা হয়ে গেছে। ধরা পড়লে আর দেখতে হবে না। শোন, তাড়াতাড়ি চাটা শেষ কর, পালাই চ"।

মিনি অধৈর্য হয়ে বলল "বুঝতে পারছ না কেন তোমরা, শুধু জেঠুর সঙ্গে এখানে দেখা হওয়াটাই বড় কথা ছিল না"।

তাপস বললেন "অপেক্ষা কর। এখন কিছু করিস না"।

জ্যোতির্ময় ঘরে ঢুকে বললেন "এখন ক'টা বাজে?"

তাপস ঘড়ি দেখলেন "পাঁচটা"।

জ্যোতির্ময় বললেন "ভাল তো। বিকেল সবে। তোরা বাড়ি ফিরে যা। আমার আর দেরী হবে না। গেলে কিছু জিনিস নিয়ে চলে আসব হয়ত"।

মিনি দেখল জ্যোতির্ময় কথাগুলো বলছেন বটে কিন্তু জেঠুর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা আছে সেটা জ্যোতির্ময় লুকাতে পারছিলেন না।

সোমেন বললেন "বউদির সঙ্গে পরিচয় করাবি না?"

জ্যোতির্ময় হাত নেড়ে বললেন "ওসব বেজাত কুজাতের সঙ্গে তোরা কেন পরিচয় করবি? তোরা যা, বাড়ি যা"।

সোমেন তাপসের দিকে তাকালেন।

৩০।

বীরেন লাউঞ্জে বসে ছিল চুপচাপ। লাউঞ্জের অন্য কোণায় আফসানা সাইদ সাক্ষাৎকার দিতে ব্যস্ত ছিলেন। হ'টা নাগাদ খান এসে তাকে বললেন "অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে, তুমি ম্যামের সঙ্গে চলে যাও"।

বীরেন চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড বসে উঠল। খান তার পিঠে হাত রাখলেন "ইউ আর এ ব্রেভ ম্যান। চিন্তা কোর না, সব ঠিক হয়ে যাবে"।

আফসানা রওনা লাউঞ্জ থেকে বেরোচ্ছিলেন।

খান বীরেনকে বললেন "হ্যাপি জার্নি, সি ইউ এগেইন"।

বীরেন হাঁটতে শুরু করল।

এতক্ষণ হয় নি, এখন হঠাৎ করেই তার চোখ ঝাপসা হল, বাবা মার কথা মনে পড়ল।

সিকিউরিটি চেকিং হতে বেশিক্ষণ লাগল না। প্লেনে যাত্রীদের লাইন শুরু হয়েছিল। সে লাইন দিতে যাচ্ছিল একজন কম্যান্ডো এসে তাকে বলল লাইন দেবার দরকার নেই। বাকি যাত্রীরা তাকে কৌতূহলী চোখে দেখছিল।

বীরেন মাথা নিচু করে প্লেনের ভেতরে প্রবেশ করল। আফসানা সাইদের পাশের সিট বরাদ্দ হয়েছে তার জন্য। আফসানা তাকে দেখে হাসলেন। বললেন "হ্যাপি

জার্নি"।

বীরেন হাসল "সেম টু ইউ ম্যাম"।

লবিতে বসে থাকা অবস্থাতেই বীরেনের মনে পড়েছিল, আফসানা সাইদের নাম সে পড়েছে খবরের কাগজে। পাকিস্তান সহ বিশ্বের অনেক দেশের মৌলবাদীদের নিশানাতেই আছেন আফসানা। মৌলবাদীদের হাতে নারীত্বের অবমাননা নিয়ে বেশ কিছুদিন হল লড়াই চালাচ্ছেন। পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশে তার ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। কিছুদিন আগে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে এসেছেন। বেশিরভাগ সময়েই অজ্ঞাতবাসে থাকেন কিন্তু এদেশের বিভিন্ন ধার্মিক সংগঠনের বিষনজরে আসতে বেশি সময় নেয় নি। আলিপুরে একটা বক্তৃতা দেওয়ার সময় আফসানার মুখে কালি মাখানোর চেষ্টা হয়ে গেছে।

নিজে থেকেই প্রশ্নটা বেরিয়ে এল তার "বার বার বেঁচে ফিরতে কেমন লাগে ম্যাম?" আফসানা তার দিকে তাকিয়ে বললেন "এই একই প্রশ্ন খানিকক্ষণ আগে যিনি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন তিনিও করলেন। তাকেও আমি একই কথা বললাম, আমি তো নিজেও জানি না আমি কীভাবে ফিরলাম, শুধু মনে হয়, যার নাম জড়িয়ে এই পৃথিবীতে এতগুলো সংগঠন মানবতা বিরোধী কাজগুলো করছে, তারই হয়ত আমার প্রতি কোন দয়া আছে, তার জন্যই হয়ত বেঁচে ফিরি প্রতিবার"। বীরেন মুগ্ধ হল, ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। কথাগুলো মনে থাকবে তার বহুদিন।

এয়ার হোস্টেসরা নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারাবিবরণী শুরু করেছেন, বীরেনের আর আগের দিনগুলোর মত টেনশন আসছিল না, তার মনে হচ্ছিল এই পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা জীবনটাকে আবার নতুন করে বাঁচতে হবে। সে মন দিয়ে শুনছিল সবটা।

প্লেন রানওয়ে দিয়ে দৌড় শুরু করেছে। বীরেন জানলার বাইরে তাকাল। সব কিছু আর পানসে লাগছে না, ভাল লাগছে আবার নতুন করে। খানিকক্ষণের মধ্যেই প্লেন আকাশ ছুঁল, বীরেন চোখ বন্ধ করল, অনেক দিন পরে একটা ঘুম চাই তার। শান্তির ঘুম।

ঘুমিয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে নি, কোন একজনের ডাকে তার ঘুম ভাঙল। বীরেন চোখ খুলে দেখল আফসানা সাইদ হাসিমুখে বলছেন "বীরেন তোমাকে আমার বহু পুরনো বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করাই। মিট হিম"। বীরেন দেখল তার আফসানা সাইদের পাশে হাসি হাসি মুখে মীর্জা বসে আছেন।

৩১।

সন্ধ্যে গড়িয়েছে। সবাই চুপচাপ বসে ছিলেন।

ইয়াসমিন রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন, জ্যোতির্ময় টিভি চালিয়ে শেয়ারের খবর দেখছিলেন। সোমেন, তাপস বেরোবেন বেরোবেন করেও বেরোতে পারছিলেন না। অনেকক্ষণ পরে টিভি বন্ধ করে জ্যোতির্ময় নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন "স্কুলের কথা মনে পড়ে তোদের? সেই যে প্রার্থনা হত? প্রার্থনা শেষে পিটি স্যার বলতেন এদেশ আসলে সবার। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রীষ্টান, সবার। সময় যত গড়িয়েছে, তত বুঝতে পেরেছি, ওই সবই আসলে আবেগের কথা। আসলে এই দেশটা সংখ্যাগুরুর। তারা যা বলবে তাই আইন, যারা যা লিখে দেবে তাই ইতিহাস, যে দেশে একটা রাজ্যের লোক বাস ভর্তি স্কুল ছাত্রদের দিকে ঢিল মারলেও তারা বীরের জাত হয়, সেই দেশেই একটা রাজ্যে স্কুল ছাত্ররা তাদের স্কুল মিলিটারিরা নিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করলে তাদের দেশদ্রোহী বলা হয়। সংখ্যালঘু উন্নয়নের নামে নির্লজ্জ তোষণ হয়, আর সংখ্যাগুরুই ঠিক করবে ভাল সংখ্যালঘু কে, আর কে খারাপ সংখ্যালঘু। যে তার অপছন্দের মাংস খাবে না, যে তার পুজোর দিনে তার প্যান্ডেল খাটিয়ে দেবে, সেই ভাল সংখ্যালঘু। তার পরিবর্তে কী হবে? তুমি তাকে তার খাদ্যাভ্যাস পালন করতে দেবে না, তুমি তাকে তার ধর্মমত পোশাক পরলে রাস্তাঘাটে হেনস্থা করবে, মব লিঞ্চিং করবে..."

জ্যোতির্ময় কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলেন, সোমেন বাধা দিলেন "কথাগুলো তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার কথা না দাদা তুই ঠিকই বলেছিস।

এও মানছি তুই যা করেছিস ঠিক করেছিস, এবার কী চলছে আমাদের একটু স্পষ্ট করে বলবি প্লিজ?"

জ্যোতির্ময় বললেন "ক'টা বাজে এবার?"

সোমেন বললেন "সাড়ে ছটা বাজে"।

জ্যোতির্ময়ের মুখে হাসি ফিরে এল, "বাহ, দাঁড়া নিউজ চ্যানেলটা দি, খবর শুনি। তোরা রাতে খেয়ে যেতে পারিস, ইয়াসমিনের রান্নার হাত চমৎকার"। জ্যোতির্ময়ের হঠাৎ এতটা পরিবর্তনে সোমেন অবাক হলেন। এতক্ষণ জ্যোতির্ময় সব কথাতেই কেমন তেড়ে তেড়ে আসছিলেন, এখন হঠাৎ খেয়ে যেতে বলছেন, সোমেনের হঠাৎ করেই মনে হল দাদার কি তবে সত্যিই মানসিক কোন সমস্যা হচ্ছে?

কলিংবেল বেজে উঠল।

জ্যোতির্ময় গলা তুললেন ইয়াসমিনের উদ্দেশ্যে "দরজাটা খোল তো। ফিরোজ এল বোধ হয়"।

ইয়াসমিন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দরজা খুললেন। পরক্ষণেই তার আর্তচিৎকার শোনা গেল এই ঘর থেকে। সবাই তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন বেশ কয়েকজন কম্যান্ডো বাড়ির ভেতর প্রবেশ করেছে। ইয়াসমিনের মাথায় একজন

রিভলভার তাক করে রেখেছেন পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে। জ্যোতির্ময়কে দেখেই তুষার রঙ্গনাথন বলে উঠলেন "আপনার কর্মকান্ড আমরা ধরে ফেলেছি মিস্টার ভট্টাচার্য ওরফে বম্ব স্পেশালিস্ট জনাব হাসান মাকসুদ। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট"।

সোমেন আপস দুজনেই অবাক হয়ে তুষারের দিকে তাকালেন। জ্যোতির্ময় নিজের মাথার ওপরে হাত দুটো তুলে দিয়ে বললেন "ওদের ছেড়ে দিন ইন্সপেক্টর। ওরাও আপনাদের মত আজকেই জানল। আমার ভাই দুজন। ওরা নির্দোষ"।

তুষার হাসলেন "তা তো জানি, ওরা না থাকলে কি আর এখানে আসতে পারতাম আমরা?"

তুষার মিনির দিকে তাকালেন "থ্যাঙ্কস, মোবাইল লোকেশন শেয়ার করবার জন্য"। জ্যোতির্ময় আশাহত চোখে প্রথমে মিনি, পরক্ষণে সোমেনের দিকে তাকালেন, বললেন "দেখলি? দেখলি তো তোরা সংখ্যাগুরুরা কেন বিশ্বাসযোগ্য নোস?" একজন এগিয়ে এসে জ্যোতির্ময়ের হাতে হ্যান্ড কাফ পরিয়ে দিল। ইয়াসমিনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ঘরের এক কোণায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তুষার বললেন "আপনার খেল খতম হাসান। বাকি জীবনটা জেলে পচতে হবে"। জ্যোতির্ময় হো হো করে হেসে বললেন "তাই নাকি? আসুন আসুন, একটু খবর দেখি"।

তুষারের ভ্রু কুঁচকে গেল "মানে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আসুন না, সবাই মিলে খবর দেখার মজাই আলাদা"। তুষার বললেন "না না, একেবারেই না। চলুন"।

জ্যোতির্ময় হাসলেন "তবে আমিই বলি। আজ সন্ধ্যে সাড়ে ছটার মুম্বই কলকাতা ফ্লাইট হাইজ্যাকড হয়েছে জাস্ট নাও। ভুলবেন না, আফসানা সাইদের মত গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী গেস্ট আছে প্লেনে। বুঝতেই পারছেন আশা করি ব্যাপারটার ইন্টারন্যাশনাল ইম্প্যাক্ট কত হতে চলেছে। আর সোমেন তোদের গর্বের সঙ্গে জানাই, ফ্লাইটে আমার একমাত্র ছেলে, সুমনও আছে"।

সোমেন মাথায় হাত দিয়ে মেঝেতেই বসে পড়লেন। তুষার রঙ্গনাথন বাকি কম্যান্ডোদের জ্যোতির্ময়কে দেখিয়ে বললেন "ওকে আর ওর স্ত্রী দুজনকেই নিয়ে চল"।

৩২।

অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে শহরে। কাঁচের বাইরে সে বৃষ্টিপাত দেখতে দেখতে তুষার কফি খাচ্ছিলেন।

মাথুর হন্তদন্ত হয়ে এলেন, “স্যার, আপনাকে ইন্টারোগেশন টেবিলে যেতে হবে বলে মনে হচ্ছে। উনি কিছুই বলছেন না। বার বার জিজ্ঞেস করছি আপনাদের দাবী দাওয়া নিয়ে কিছু বলুন, শুধু জোরে জোরে হেসে যাচ্ছেন। শেষে বললেন আপনাকে ডাকতে। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকেও আপনাকে যোগাযোগ করতে বলছে”। তুষার কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বললেন “তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ মাথুর? এ দেশের এক একটা শহরে বৃষ্টি এক একরকম। আমি যা দেখছি দিল্লির বৃষ্টির থেকে কলকাতার বৃষ্টি অনেক সুন্দর, তবে বেস্ট বৃষ্টি আমার গ্রামের। কেরল যাই না, কতদিন হয়ে গেল”।

মাথুর বুঝলেন তুষার এখন চাপ হালকা করতে চাইছেন। চাপ যখনই প্রবল হয়ে ওঠে, তুষার অন্য বিষয়ে চলে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির থেকে দূরে চলে যান কিছুক্ষণের জন্য। এর ফলে নাকি যখন আবার বর্তমান পরিস্থিতিতে মনঃসংযোগ করেন, তখন সেটা প্রবলভাবে করতে পারেন।

মাথুর চুপ করে থাকলেন। তুষার বলে চললেন “বাড়ি থেকে স্কুল যাওয়ার রাস্তায় একটা পুকুর পড়ত। বৃষ্টির সময়টা কোন কোন দিন স্কুল পালিয়ে সে পুকুর পারে গিয়ে বসতাম। অদ্ভুত একটা সময় ছিল। আজকাল মনে হয়, হয়ত সেরকম কোন সময়ই ছিল না। সবটাই ভ্রম”।

মাথুরের ফোন ভাইব্রেট করে উঠল। মাথুর দেখলেন খান মেসেজ পাঠিয়েছে “এনি প্রগ্রেস?”

মাথুর লিখলেন “নো”।

তুষার বেশ খানিকক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকলেন, কফিটা শেষ করতেই তার গলার স্বরে কেজো ভাবটা চলে এল, গম্ভীর গলায় বললেন “সমস্যা বাড়ছে মাথুর। প্রতিবারে, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। প্রথমে হিন্দু মুসলমান, তারপর জেনারেল এস সি এস টি, পরক্ষণেই কাশ্মীরি পাকিস্তানি...”

মাথুর বললেন “মিনিস্ট্রিতে ফোনটা ধরে দেব স্যার?”

তুষার মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন। মাথুর ফোন ধরে দিলেন, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ডিফেন্স মিনিস্টারের উত্তেজিত গলা ভেসে এল “কিছু জানা গেল?” তুষার বললেন “যা ফুয়েল আছে তাতে চারঘন্টা পরে কোথাও না কোথাও একটা ল্যান্ডিং ওদের করতেই হবে স্যার”।

“সেসব তো আমি জানি, আমাকে বল ওদের ডিমান্ডটা ঠিক কী? ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার ফোনে তো অস্থির হয়ে যাচ্ছি! আফসানা সাইদ আছেন বুঝতে পারছ তো! কোন অর্গানাইজেশন এরা?”

“নো আইডিয়া স্যার”।

"কিছু একটা কর প্লিজ। রাখছি এখন। আপডেট দিও যা আসবে। আমার কোলকাতা আসার প্রয়োজন আছে?"
"না স্যার। আমি জানাব কোন আপডেট হলে"।
ফোনটা কেটে গেল। তুষার বললেন "চল"।
দুজনে বেরলেন। একটা অন্ধকার ঘরে জ্যোতির্ময়কে বসিয়ে রাখা হয়েছে। মাথায় কালো কাপড় পরানো। হাতদুটো পিছমোরা করে বাঁধা। ইয়াসমিনকে তার পাশেই একইভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে।
তুষার ঠান্ডা গলায় বললেন "ডিমান্ড কী আপনাদের?"
জ্যোতির্ময় বললেন "আপাতত মাথার কাপড়টা সরান। আমার স্ত্রীকে অন্য কোন সেলে নিয়ে যান। এসব ব্যাপারে ও তেমন কিছুই জানে না"।
মাথুর বললেন "সেটা সম্ভব নয়"।
তুষার মাথুরকে বললেন "যা চাইছে কর"।
মাথুর ঘর থেকে বেরিয়ে একজন লেডি অফিসারকে ডাকলেন। লেডি অফিসার ইয়াসমিনকে নিয়ে গেলেন।
মাথার কাপড় সরিয়ে দেওয়া হল জ্যোতির্ময়ের।
তুষার জ্যোতির্ময়ের চোখের দিকে তাকালেন "বলুন"।
জ্যোতির্ময় চোখ ছোট করে কয়েকসেকেন্ড তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "দিন পনেরো আগের কথা। অনন্তনাগে একটা সাত বছরের মেয়ে, নাম আলিমা, বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। ঠিক সেই সময় একটা বিক্ষোভ শুরু হয় চার মাথার মোড়ে। আপনাদের আর্মি পেলেট গানে গুলি ছুড়তে শুরু করে। মেয়েটার দুটো চোখ নষ্ট হয়ে গেছে"।
তুষার বললেন "সরি টু নো। খুব দুঃখজনক ঘটনা"।
জ্যোতির্ময় বললেন "এর একমাস আগে শ্রীনগরে এক বাড়ির পনেরো বছরের ছেলে ফারহান স্কুল থেকে ফিরছিল। একই পরিস্থিতি, ওই সময়টা একটা বিক্ষোভ চলছিল। আপনাদের আর্মি বিনা কারণে তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে দিল। ছেলেটার পেটে এমন একটা ঘা হল, ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না। বাঁচানো যেত হয়ত ঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে, কিন্তু যেখানে হাসপাতালের রাস্তা অবধি কারফিউ লেগে আছে সেখানে কী করে পৌঁছনো যাবে! জানেন?"
তুষার মাথা নাড়লেন, "জানি না। তবে আপনি যদি এখন আপনার কী চাই সেটা বলেন, তাহলে বোধ হয় আমাদের সুবিধা হয়। আশা করি বুঝতে পারছেন এবার ভাল কথায় বলছি, এরপরে সেটা..."
জ্যোতির্ময় তুষারের চোখে চোখ রাখলেন "আপনাদের দেশের যে শিল্পপতি দেশের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেল, তার সঙ্গে আপনারা দেখা হলে

কোন দিন খারাপ ভাষায় কথা বলতে পারবেন মিস্টার রঙ্গনাথন?”

তুষার সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন “আপনারা ফান্ডিং কোত্থেকে পাচ্ছেন? লন্ডন?”

জ্যোতির্ময় বললেন “আপনাদের ফান্ডিং কে করে? সি আই এ?”

তুষার জ্যোতির্ময়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন “আপনি কাশ্মীরে যে ব্লাস্টটা করিয়েছেন তাতে কোন নেতা মন্ত্রী মারা যায় নি, মারা গেছে গরীব জওয়ান। দিল্লিতেও তাই। মুম্বইতে সফল হলেও ক'টা শিল্পপতি মন্ত্রী মরত বলে আপনার মনে হয়?”

জ্যোতির্ময় কাঁধ ঝাঁকালেন “পার্ট অফ দ্য সিস্টেম। একটা কোথাও পৌঁছতে হলে জানিজি গ্রাউন্ড লেভেল থেকেই শুরু করতে হয়। বাই দ্য ওয়ে, চারজন জওয়ান মরেছে। জাস্ট দুদিন আগে তারা শহরে কারফিউ চলাকালীন বেধড়ক লাঠি চার্জ করেছিল। আই হ্যাভ নো সিমপ্যাথি ফর দেম”।

তুষার বিদ্রূপের হাসি হাসলেন “গ্রেট। আপনাদের ফান্ডিং এর সোর্সগুলো সম্পর্কে বলি তবে? পাকিস্তান, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কোরাপ্টেড কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। পাকিস্তানে হিন্দু বা শিখদের অবস্থা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা বলুন তো? পাক অকুপায়েড কাশ্মীরে যে সংগঠনগুলোকে খোলা কুকুরের মত ছেড়ে রেখেছে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট, তারা সেখানকার মহিলাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে সে সম্পর্কে আপনি জানেন? যদিও আপনাদের ফান্ডিং পুরোটাই পাকিস্তান থেকে আসছে তাও না। আরও যে সব সংগঠন আপনাদের টাকা দেয় তাদের ওখানে শিশু বা মহিলারা কাশ্মীরের থেকে ভাল আছেন তো? আপনি তাদের হাত ধরে ইন্ডিয়ার সিস্টেম ঠিক করবেন ভেবেছেন বুঝি?”

জ্যোতির্ময় বললেন “ঘরটা তো আগে। স্বয়ং সুভাষ চন্দ্র বোসকে ব্রিটিশ তাড়াতে হিটলারের মত কসাইয়ের হাত ধরতে হয়েছিল”।

তুষার জ্যোতির্ময়ের দিকে ঝুঁকলেন “হেল উইথ ইওর আইডিয়ালিজম। কী ডিমান্ড বলুন”।

জ্যোতির্ময় হাসলেন “একটা সিগারেট খাওয়ান”।

তুষার রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

৩৩।

মিনির মা যে বিকেলেই এসেছিলেন মিনি জানত না। বাড়ি ফিরে জানতে পারল।

সোমেন এসেই বারান্দার চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়েছেন। মিনির মা অনিন্দিতা খানিকটা ফোনে শুনেছিলেন। মিনিকে দেখেই বললেন "কী রে কী হল?"

মিনি মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

গোটা দিনটা যে এভাবে যাবে সে কোন দিন দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। তাপস গুছিয়ে বললেন পুরোটাই। প্রতিমা অনিন্দিতাকে বললেন "দিদি আমরা কি কোনদিন কল্পনাতেও আনতে পেরেছিলাম বড়দা ভেতরে ভেতরে এত কিছু করে ফেলছেন?"

অনিন্দিতা সোমেনের পাশের চেয়ারে বসে বললেন "এরপরে কি লোকেরা আমাদের বাড়িটাকে টেররিস্টের বাড়ি বলবে? মেয়েটার বিয়ে দেব কী করে?"

মিনি এত কিছুর মধ্যেও মার তার বিয়ে নিয়ে কথা বলায় বিরক্ত হয়ে মাকে একটা চিমটি কাটল।

সোমেন বললেন "চিন্তা কোর না বাড়ির বাইরে এখন থেকেই সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন হয়ে গেছে, তল্লাশি দল এল বলে"।

অনিন্দিতা ভয়ার্ত চোখে সোমেনের দিকে তাকিয়ে বললেন "আমাদেরও টেররিস্ট ভাবছে নাকি?"

মিনি বলল "তা কেন, আমি না বললে ওরা জানতেন কী করে? তুমি একদম টেনশন কোর না তো মা, বাবা তোমায় ভয় দেখাচ্ছে"।

অনিন্দিতা রাগী চোখে তাকালেন সোমেনের দিকে। তাপস একটু গলা খাকড়িয়ে বললেন "যাই হোক, কথা হল বড়দার মধ্যে এত চেঞ্জ এল আর বুঝতেই পারলাম না"!

সোমেন বললেন "আসলে আমরা সব সময় নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে, বাড়িতে একটা লোক আছে, সেটাই ভুলে যেতাম"।

প্রতিমা বললেন "তোমরা বড়দার ছেলের যা বয়েস বললে তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে যে গোটা ব্যাপারটা একদিন কিংবা দুদিনে হয় নি। কোন কোন মানুষ থাকে, যারা এত অনায়াসে মিথ্যেকথা বলে যে তাদের চোখের পলক পর্যন্ত পড়ে না। চেঞ্জটা আমাদের কারও চোখে পড়বেই বা কী করে?"

সোমেন বললেন "তোমরা শুধু সংসার নিয়েই পড়ে আছো, আসল জিনিসটা নিয়ে কেউ কোন কথাই বলছ না। বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারছ? সেই যে আই এস আই এসে একজন বাঙালি ধর্মান্তরিত হয়ে তাদের নেতৃত্ব দিত, মনে আছে খবরের কাগজ কদিন কতটা এক্সাইটেড ছিল? সবার মুখে একই আলোচনা। আর এবার তো খোদ কলকাতার বুকে এই ঘটনা ঘটল। যা বুঝছি বাড়ি ঘর দোর ছেড়ে আবার রিফিউজি হয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। টিকতে পারব না নইলে। মানুষের প্রশ্নে প্রশ্নেই পাগল হয়ে যেতে হবে। আর, কতগুলো নিরীহ লোককে খুন করেছে... ভাবতেই

তো! বড়লাই নাকি মাস্টারমাইন্ড এসবের পিছনে। যে লোকটা একটা পিপড়ে মারে নি কোন দিন সে নাকি এসব করেছে! নেহাত ওরা আমাদের বাড়ির ঠিকানা মিডিয়াকে দেয় নি, নইলে তো গোটা শহরের লোক এ বাড়ি মাটিতেই মিশিয়ে দেবে"। সোমেন তেতো মুখে মাথা নাড়ালেন।

তাপস অস্বস্তির সঙ্গে বললেন "বাড়ি ভাবছিস তুই? আমি তো ভাবছি এ রাজ্য ছেড়েই চলে যেতে হবে। সবাই চিনে যাবে। আত্মীয়স্বজন..."

প্রতিমা বললেন "আচ্ছা, তোমরা সবাই বলছ বড়লার জন্য তোমাদের প্রেস্টিজ নষ্ট হচ্ছে, তোমরা কেন ভুলে যাচ্ছ বলত মিনি না থাকলে এত কিছু জানাও যেত না। মানুষ তো সেটাও দেখবে!"

মিনি কাকীমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

তাপস উঠে টিভি চালালেন।

সংবাদ পাঠক উত্তেজিত ভঙ্গীতে হাইজ্যাকিং এর বর্ণনা দিচ্ছে "এই মুহূর্তে সব থেকে বড় খবর, মুম্বই কোলকাতা আই এন এস ফ্লাইট হাইজ্যাকারদের কবলে পড়েছে। সরকার থেকে প্রতিমুহূর্তে চোখ রেখে চলেছে ফ্লাইট থেকে কোন খবর পাওয়া যায় নাকি, কিন্তু ঘটনা হল হাইজ্যাকাররা এখনও অবধি কোন দাবী পেশ করে নি। কোন টেররিস্ট অরগানাইজেশন এখনও পর্যন্ত এই হাইজ্যাকিং এর দায় স্বীকার করে নি। প্লেনের মধ্যে আছেন বিতর্কিত লেখিকা আফসানা সাইদ সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সন্দেহ করা হচ্ছে পাকিস্তানের সরাসরি হস্তক্ষেপেই এই হাইজ্যাকিংটি ঘটেছে। যদিও পাকিস্তান এর দায় স্বাভাবিকভাবেই নিতে অস্বীকার করেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে। হাইজ্যাকাররা কারা? তারা কী চায়? দেখতে থাকুন..."
সোমেন হতাশ গলায় বললেন "দেখ, যা করার সেটা করেই ছাড়ল"।

কলিং বেল বেজে উঠল। সোমেন বললেন "দেখ তাপস, সম্ভবত ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো থেকে লোক এসেছে, বড়লার ঘর সার্চের জন্য"।

তাপস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে "হে ভগবান" বলে দরজা খুলতে রওনা হলেন।

৩৪।

জ্যোতির্ময়ের ঘর তল্লাশি হচ্ছে। বইয়ের র‍্যাক থেকে শুরু করে সব কিছু ওলোট পালোট করা হচ্ছে। ঘর ময় ধুলো ভর্তি হয়ে গেছে। মাথুর বেশ খানিকক্ষণ তল্লাশি

দেখে নিচে নেমে এলেন। ড্রয়িং রুমে বাড়ির সবাই বসে ছিল। মাথুর বললেন "জল খাওয়াতে পারেন?"

প্রতিমা বললেন "নিশ্চয়ই। চা খাবেন?"

মাথুর বললেন "আপনাদের কষ্ট হবে"।

প্রতিমা উঠলেন "না না। আপনি বসুন প্লিজ"। অনিন্দিতাও গেলেন প্রতিমার সঙ্গে।

মাথুর বসলেন। ঘাম মুছলেন কপালের। সোমেন এবং তাপস মাথা নিচু করে বসে ছিলেন।

মাথুর মিনির দিকে তাকিয়ে হাসলেন "এই যে বাহাদুর পার্থ, তুমি আর কিছু পাও নি তোমার আঙ্কেলের ঘর থেকে?"

মিনি ঘাবড়াল না, একটু ভেবে বলল "আমি তো বুক শেলফ বাদে আর তেমন কিছু দেখি নি। ওখানেই ওই বাড়ির অ্যাড্রেসটা পেয়েছিলাম"।

মাথুর চিন্তিত মুখে বললেন "স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার হল তেমন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। ইভেন ওই বাড়ির কম্পিউটার ঘেঁটেও তেমন কিছুই পাচ্ছি না। এরকম ট্রিকি সিচুয়েশনে আমরা কখনও পড়ি নি"।

সোমেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছেন অফিসার? আজ সকালের আগে, মানে আমার মেয়ে যদি আমাকে বার বার এটা নিয়ে নক না করত, আমরা কিছুই জানতাম না। এমন কি কোন দিন ভাবতেও পারি নি"।

মাথুর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "ইওর ব্রাদার ইজ আ জিনিয়াস স্যার। ওদের অর্গানাইজেশনটা যেভাবে অপারেট করল, আমাদের ইন্টেলিজেন্স কোন কিছু আঁচ পর্যন্ত করতে পারে নি"।

সোমেন আগ্রহী হলেন "কী… কী বললেন? অর্গানাইজেশন? কী নাম অর্গানাইজেশনের"?

মাথুর বললেন "নো আইডিয়া। কিচ্ছু বের করা যায় নি"।

মিনি কী একটা মনে হতে বলল "লাস্ট মার্চে জেঠু দিন পনেরো বাড়ি ছিল না"।

মাথুর চোখ ছোট করলেন "ডেটটা প্রিসাইসলি বলতে পারবে?"

মিনি বাবার দিকে তাকাল "ডেটটা মনে আছে বাবা?"

সোমেন বললেন "টেন্থ থেকে হবে। ওই সময় আমাদের অফিসের ক্লোজিংএর কাজ শুরু হয়েছিল মনে আছে। দাদা দশ নাগাদ হঠাৎ একদিন সকালে বেরোল"।

মাথুর ফোনটা বের করে উত্তেজিতভাবে ফোনের অরগানাইজার বের করলেন। বেশ খানিকক্ষণ ফোন ঘাঁটার পরে উঠলেন "এক্সকিউজ মি"।

ঘরের বাইরে গেলেন। আপস ধরা গলায় বললেন "কী যে হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তাও ভাল ওরা সাধারন গাড়িতে এসেছেন। পুলিশের গাড়িতে এলে পাড়ার লোক জড়ো হয়ে যেত এতক্ষণে"।

সোমেন হতাশভাবে মাথা নাড়লেন।

মাথুর তুষারকে ফোন করছিলেন বাইরে গিয়ে, একটা রিং হতেই তুষার ধরলেন "বল মাথুর, এনি আপডেট?"

মাথুর বললেন "কিছু পাওয়া যাচ্ছে না স্যার"।

তুষার তেতো গলায় বললেন "তাহলে ফোন করছ কেন?"

মাথুর বললেন "স্মার্ট পার্ট, মানে যে আমাদের সঙ্গে কন্টাক্ট করেছিল, একটা ইম্পরট্যান্ট ক্লু দিয়েছে, মানে আমার মনে হচ্ছে স্যার ক্লুটা ইম্পরট্যান্ট"।

তুষার বললেন "কী?"

মাথুর বললেন "মার্চের দশ থেকে দিন পনেরো উনি বাড়ি ছিলেন না"।

তুষার বললেন "সো?"

মাথুর উত্তেজিত গলায় বললেন "স্যার আপনি ভুলে যাচ্ছেন মার্চের তেরোতে লালচকে ওদের একটা সিক্রেট মিটিং হয়েছিল। আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম। লস্কর রিপ্রেজেন্টেটিভও ছিল"।

তুষার কয়েক সেকেন্ড থমকে বললেন "মাই গড! মাই গড। ইউ আর রাইট! সায়ক সে সময়টা কোথায় ছিল?"

মাথুর বললেন "কাবুলে স্যার"।

তুষার বললেন "হু। অনেকগুলো পাজল এদিক ওদিক হয়ে গেছে। কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। তুমি কিছু মেলাতে পারছ মাথুর?"

মাথুর বললেন "না স্যার। আপনি বুড়োটাকেই জিজ্ঞেস করুন"।

তুষার একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বললেন "অনেক হয়েছে, আমি এবার থার্ড ডিগ্রি অ্যাপ্লাই করব ভাবছি। অত জনের লাইফ আর দেশের সম্মান নিয়ে আমি আর রিস্ক নিতে পারছি না"।

মাথুর বললেন "ওর ওয়াইফের ইন্টারোগেশন হয়ে গেছে স্যার?"

তুষার বললেন "হু। শি নোজ নাথিং। শুধু ছেলের কথা বললে খানিকটা ইমোশনাল হচ্ছেন। বাট দিস ম্যান ইজ..."

মাথুর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন একজন অফিসার দোতলা থেকে একটা পাসপোর্ট নিয়ে নেমে এলেন।

৩৫।

জ্যোতির্ময় চোখ বন্ধ করে চুপচাপ অন্ধকারে বসেছিলেন।

তুষার আলো জ্বেলে ঘরে ঢুকলেন।

জ্যোতির্ময় জাগলেন না। একইভাবে বসে থাকলেন।

তুষার জ্যোতির্ময়ের সামনের চেয়ারে বসে বললেন "ওদের শ্রীনগর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে দেওয়া হয়েছে"।

জ্যোতির্ময় চোখ খুললেন।

তুষার বললেন "বলুন এবার কী দাবী দাওয়া আপনাদের"।

জ্যোতির্ময় বললেন "ওরাই বলুক। আমার বয়স হয়েছে। যতটুকু করার ছিল করেছি"।

তুষার বললেন "মেয়ে এবং বাচ্চাদের ছেড়ে দিতে বলুন"।

জ্যোতির্ময় চোখ ছোট ছোট করে তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "কেন? কাশ্মীরের কোন ঘরে আপনাদের মিলিটারি মেয়ে এবং বাচ্চাদের ছেড়ে দেন?

আমরা খামোখা ছাড়তে যাব কেন?"

তুষার কাঁধ ঝাঁকালেন "ওকে। অ্যাস ইউ উইশ। একটা গেম খেলা যাক মিস্টার ভট্টাচার্য ওরফে হাসান মাকসুদ। খেলবেন?"

জ্যোতির্ময় কিছু বললেন না। ঠান্ডা চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তুষার বললেন "এই ঘরের পাশেই দুটো পাশাপাশি কাঁচের ঘর আছে। কিন্তু একটা ঘরের শব্দ আরেকটা ঘরে পৌঁছয় না। আমরা একটা ঘরে আপনার স্ত্রীকে রাখব, পাশের ঘরে আপনাকে। চলুন যাওয়া যাক"।

জ্যোতির্ময় এবারেও কিছু বললেন না।

তুষার উঠে দরজার বাইরে থাকা একজনকে নির্দেশ দিলেন জ্যোতির্ময়কে পাশের ঘরে নিয়ে যেতে। নির্দেশ মানলেন অফিসার। জ্যোতির্ময়কে পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

জ্যোতির্ময় দেখতে পেলেন ইয়াসমিনকে। চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে ইয়াসমিনকে। ইয়াসমিন তার দিকে তাকালেন।

জ্যোতির্ময় কিছু বললেন না। চুপ করে থাকলেন।

তুষার বললেন "খেলাটা শুরু করি মিস্টার মাকসুদ?"

জ্যোতির্ময় তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "কী খেলা?"

তুষার বললেন "আমরা আপনার স্ত্রীর একটা আঙুল কেটে দেব। যদিও এই দুটো ঘরই সাউন্ড প্রুফ তবে আমরা ওই ঘরের সাউন্ডটা অন করে দেব যাতে ওর আর্তনাদ আপনি শুনতে পান। আর ইউ রেডি?"

জ্যোতির্ময় জ্বলন্ত চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "এ কী ধরণের অসভ্যতা?"

তুষার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন "এই যে আমাদের দেশ মিস্টার ভট্টাচার্য বা মাকসুদ, এই যে আমাদের দেশ, একটা বিরাট উদারনৈতিক দেশ। এই দেশ অনেক

কিছু আলাউ করে জানেন তো! ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি তো! হিউম্যান রাইটস আছে মানুষের। যদিও অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ, একেক জনের জন্য একেক রকম আইন এবং সেটা আমরাও মানি, কিন্তু সমস্যা হল এত দুর্নীতি থাকলেও আমাদের দেশে কিছু মানুষ আছে যারা আইন কানুন মেনে চলে। ভদ্রতা মেনে চলে। কারণ তাদের মানতে বাধ্য করা হয়। এর উলটো দিকে আছেন যেমন আপনি। জওয়ানদের খুন করালেন, যে দেশের সব থেকে এফিশিয়েন্ট অফিসারকেই খুন করালেন, চাঁদনি চকের মত জায়গায় ব্লাস্ট করালেন। এবার আপনার জন্য হিউম্যান রাইটস কী বলবে, তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকলে তো আমাদের চলবে না। আপনার বাপেরা মিডল ইস্টে ঘর ঘর থেকে মেয়েদের টেনে এনে খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয়, আর আপনাদের মত লোকেদের থেকে, আপনাদের মত শুয়োরদের থেকে আমাদের শিখতে হবে কোনটা অসভ্যতা আর কোনটা অসভ্যতা নয়? অনিস!"

তুষার গলা তুললেন। অনিস একটা যন্ত্র নিয়ে ইয়াসমিনের ঘরে প্রবেশ করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ইয়াসমিনের তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল এ ঘর থেকে। ইয়াসমিনের পায়ের একটা আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছে। ঘরের সাদা মার্বেলের মেঝে ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

জ্যোতির্ময় চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তুষার মন দিয়ে সিগারেটটা শেষ করে বললেন "আপনাদের ক্যাম্পগুলোতে এগুলো শেখানো হয় না? যন্ত্রণা সহ্য করা?"

জ্যোতির্ময় বললেন "এর বেশি আপনারা আর কী পারেন? এটাই তো পারেন!

ইয়াসমিন কোন দিন কোন ক্যাম্পে যায় নি,ওকে ছেড়ে দিন! নইলে কিন্তু এর ফল ভাল হবে না!"

তুষার বললেন "ইসলাম আপনাদের শিখিয়েছে মানুষ খুন করতে? কোন ইসলাম বলেছে একটু বলুন তো! দেশের নিরীহ মানুষদের মেরে আপনারা জিহাদ করবেন?"

বাইরে থেকে একজন দরজা নক করল। তুষার ঘর থেকে বেরোলেন।

ডিফেন্স মিনিস্টার ফোন করেছেন, গলায় উত্তেজনা "কী আপডেট কিছু জানালেন না তো!"

তুষার বললেন "ওরা শ্রীনগর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে চেয়েছিল, করানো হয়েছে। মহিলা এবং শিশুদের ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল, রাজি হয় নি"!

"রাজি হয় নি মানে কী? ইয়ার্কি নাকি?"

তুষার বললেন "দাবী দাওয়া না জানালে আমি ঠিক কী করব বলতে পারবেন স্যার?"

"রেসকিউ টিমকে বলুন ইমিডিয়েটলি অপারেশনে নামতে!"

"এর মধ্যে যদি ওরা আফসানা সঈদকে মেরে ফেলে!"

"উফ! তাহলে কী করবেন?"

"ওরা নার্ভ গেম খেলতে চাইছে স্যার, আমাদেরও খেলতে দিন"।

"কী বলছেন আপনি? মাথা ঠিক আছে আপনার? এখন খেলার সময়?"

"তাহলে কী করব আপনারা ডিসিশন দিন স্যার!"

"রাখুন এখন, পরে ফোন করছি"।

ফোনটা কেটে গেল। তুষার ফোনটা ছুড়ে মারলেন। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে জোর পায়ে জ্যোতির্ময়ের ঘরে ঢুকে জ্যোতির্ময়ের মুখে প্রবল জোরে একটা ঘুষি মেরে বললেন "পৃথিবীর প্রত্যেকটা ধর্মীয় ছাগলকে জাস্ট খোলা বন্দুকের সামনে গুলি করে মারা উচিত"।

জ্যোতির্ময়ের নাক থেকে গলগল করে রক্ত বেরনো শুরু করল। তুষার চেয়ারটা টেনে পায়ের ওপর পা তুলে রাগী গলায় ফিসফিস করে বললেন "নো সিমপ্যাথি ফর ইউ... সিম্পলি নো সিমপ্যাথি ফর ইউ..."

৩৬।

রাত বারোটা। শ্রীনগর এয়ারপোর্টে প্লেনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্লেনের ভেতরে সবাইকে একটা জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। মীর্জা একটা অত্যাধুনিক রাইফেল নিয়ে ঘুরছেন প্লেনের ভেতরে। এয়ারবাসের ভেতরটা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে। ইঞ্জিন বন্ধ প্লেনের। একটা বিশ্রী গন্ধ ভাসছে বিমানের ভেতরে। কারও কারও নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। এয়ারপোর্টে বাকি বিমানদের অবতরণ আপাতত বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

বীরেনকে পাইলট কেবিনে নিয়ে রাখা হয়েছে আফসানার সঙ্গে। বীরেন প্রথম দিকটায় প্রবলভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। শ্রীনগরে নামার পর থেকে তার বারে বারে মনে হচ্ছে সম্ভবত আর বেঁচে ফেরা হবে না তার।

মীর্জা কেবিনের ভিতরে এসে আফসানাকে বললেন "দাবী জানতে চাইছে গভর্নমেন্ট"।

আফসানা ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে লাগাতে বললেন "কল হাসান সাহেবের সঙ্গে কথা বলাবার ব্যবস্থা করুন"।

মীর্জা বলল "জি ম্যাডাম"।

আফসানা বললেন "আশা করি যাত্রীরা কেউ বুঝে উঠতে পারে নি আমি তোমাদের সঙ্গে মিলে আছি"।

মীর্জা হেসে বীরেনের দিকে তাকালেন "একমাত্র ও ছাড়া..."

আফসানা হাসলেন "ও তো আমাদেরই সিক্রেট এজেন্ট। কাশ্মীর ব্লাস্ট, চাঁদনী চক ব্লাস্টের মূল পাণ্ডা তো ওই। ও জানলে কী ক্ষতি?"

বীরেন চমকে আফসানার দিকে তাকাল।

আফসানা বললেন "চমকে ওঠার কী আছে? তুমি জাস্ট ভাবো তো, এই দুই দেশের ঝামেলার সুযোগ নিয়ে আমাদের মত কত লোক করে কম্মে খাচ্ছে! তুমি জানো কি ইন্ডিয়া পাকিস্তানের কত টাকা শুধু ডিফেন্সের জিনিস কিনতে খরচ হয়? আর কী ভাবো তুমি? এইসব কেনা কাটায় তোমাদের পলিটিশিয়ানরা সেইন্ট সেজে বসে থাকে?"

বীরেন বলল "আপনাকে পাকিস্তান মারতে চেয়েছে, তারপরেও আপনি..."

আফসানা এবং মীর্জা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলেন। আফসানা বললেন "ওসব তো নাটক। ওগুলো না করলে ইন্ডিয়া আমাকে শেল্টার দিত? ইন্ডিয়া পাকিস্তান লড়াই তো আজব সার্কাস আসলে। এখানে পাকিস্তানের এগেইন্সটে কিছু বললে, স্বাভাবিকভাবেই আমাকে ইন্ডিয়ানরা পুজো করতে চলে আসবে। নিজেদের থেকেও বেশি ভরসা করবে। এ তো ন্যাচারাল তাই না?"

বীরেনের মাথা কাজ করছিল না। সে চুপ করে বসে থাকল।

মীর্জা বেরিয়ে গেলেন কেবিন থেকে।

বীরেন বলল "আপনারা আমাকে কেন টার্গেট করেছেন জানতে পারি?"

আফসানা বীরেনের দিকে তাকালেন "নিশ্চয়ই কারণ আছে। কারণ ছাড়া আমরা কিছু করি না। দেখো না, সব কিছু মিটে গেলে আমি যখন আবার তোমাদের দেশের অতিথেয়তা গ্রহণ করব, বিভিন্ন বলিউডের শোতে চিফ গেস্ট হয়ে যাবে তখন কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে আসলে এই দেশে থেকে আমি ঠিক কী করছি? সব কিছুরই কারণ থাকে বীরেন, নাথিং হ্যাপেনস উইদাউট আ রিজন"।

বীরেন বলল "আর মীর্জা, সুমন ওদের কী হবে?"

আফসানা বীরেনের কথার উত্তর না দিয়ে আবার ঠোঁটে লিপস্টিক মাখতে শুরু করলেন।

বীরেন সামনের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বেশ খানিকটা দূর থেকে গোটা চত্বরটা আলোয় ঝলমল করে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় আর্মি ঘিরে রেখেছে গোটা জায়গাটা।

বৃষ্টি নেমেছে বাইরেটা। বীরেন ভাবতে চেষ্টা করল ঠিক এই সময়টায় তাদের বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশের বাড়ির বাবলুদা মদের ঠেক থেকে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গান জুড়েছে। বাবলুদার বউ বাড়ির ভেতর থেকেই জোরে জোরে চিৎকার করতে শুরু করেছে। বাবা ঘুম ঘোরে মাকে বলছে "রোজ রোজ একই কীর্তন আর ভাল্লাগছে না"।

বোনের ঘরের আলো নিভেছে কিন্তু আসলে বোন ঘুমায় নি। লুকিয়ে লুকিয়ে ফেসবুক করছে। গেম খেলছে।

নিজের অজান্তেই চোখের কোণ ভিজে উঠল বীরেনের। দু তিন দিনের মধ্যে তার জীবনের সব কিছু এভাবে ওলোট পালট হয়ে যাবে সে কি কোন দিন স্বপ্নেও ভেবেছিল?

সুমন একটা প্লেট নিয়ে কেবিনে ঢুকল, আফসানাকে বলল "এখানে কয়েকটা স্যান্ডউইচ আছে। খেয়ে নিন ম্যাম"।

আফসানা বীরেনের দিকে তাকালেন "নাও, একটা স্যান্ডউইচ নাও"।

বীরেন বলল "আমার খিদে নেই"।

সুমন রিভলভার দিয়ে বীরেনের মাথায় একটা টোকা দিয়ে বলল "নাটকবাজি মারিও না, যা করতে বলা হচ্ছে করে যা"।

বীরেন সুমনের দিকে তাকিয়ে বলল "তোমার লজ্জা লাগে না, এই দেশে থেকে এই দেশেরই ক্ষতি করছ?"

সুমন বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে বীরেনের সামনে। রাগী গলায় বলল "যাদের প্রতিদিন শুনতে হয় তুমি বাঙালি না মুসলমান, ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচের দিন শুনতে হয় কাকে সাপোর্ট করছিস, মুসলিম হলেও হিন্দু সেজে নাম ভাড়িয়ে ঘর ভাড়া নিতে হয়, এই দেশটা তাদের কোন দিন ছিল না"।

বীরেন চুপ করে গেল। আর কিছু বলল না। শুধু লক্ষ্য করল সুমন আর আগের মতন বাঙাল অ্যাক্সেন্টে কথা বলছে না।

৩৭।

রাত সাড়ে বারোটা।

খান কলকাতায় এসেছেন। মাথুর, তুষার এবং খান বসেছেন।

তুষার ইলেক্ট্রিক কেটলিতে জল গরম করতে দিয়েছেন। সব সময় সঙ্গে করে টি ব্যাগ নিয়ে ঘোরেন। জল গরম হলে চা নিয়ে বসলেন। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। মাথুর উত্তেজিত অবস্থায় বললেন "স্যার, হাসানের বাংলাদেশের পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। এবং সেটা দেখে যা বোঝা যাচ্ছে, উনি বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান এবং একবার ইরাক গেছেন। মানে বাংলাদেশ থেকে উনি ইজিলি বেরিয়ে যেতেন। ওখানকার ঠিকানা দেওয়া আছে নোয়াখালির। বাঙলাদেশে আমাদের ইন্টেলিজেন্সকে জানানো হয়েছে"।

তুষার টি ব্যাগ জলে মেশাতে মেশাতে বললেন "তোমাদের বি এস এফ কী করছে? এতবার বর্ডার পার করে গেছে এসছে, একবারও ধরতে পারল না?"

মাথুর খানের দিকে তাকালেন। খান পেপারওয়েট নিয়ে খেলছিলেন। বললেন "ভারত বাংলাদেশ বর্ডার নিয়ে যত কম বলা যায় তত ভাল। এখনও প্রচুর লুপ হোলস আছে"।

তুষার বললেন "এক চক্ষু হরিণের গল্প জানা আছে? সেই যে হরিণের একটাই চোখ। আর হরিণ সে চোখটা বনের দিকে রেখে জল খাচ্ছিল, ভেবেছিল বাঘ বন থেকে আসবে। আসলে দেখা গেল বাঘটা জলে সাঁতার কেটে এসেছিল। আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা। পকিস্তান বর্ডার নিয়ে সব মাথা খারাপ করে ফেলছি, অথচ একবারও আমরা বুঝতে পারছি না বাংলাদেশ থেকে কীভাবে অনুপ্রবেশ হয়ে যাচ্ছে"।

খান বললেন "অ্যান্ড করাপ্ট পলিটিশিয়ানস। চলে আসছে, দেখা যাচ্ছে দু মাসের মধ্যে বার্থ সার্টিফিকেট বের হয়ে যাচ্ছে"।

তুষার হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে বললেন "ভোটের জন্য দেশের ইন্টারনাল সিকিউরিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করা হচ্ছে, বা হয়েছে এর আগেই, মানি ইনভলভড সবই মানছি কিন্তু আবার বল, স্যার আগে বল তো, ওদিক দিয়ে আসছে কী করে? বা এদিক দিয়েই বা যাচ্ছে কী করে"?

খান বা মাথুর কেউ কিছু বললেন না।

তুষার বললেন "ডিজগাস্টিং। এই লোকের ছেলেও টেররিস্ট। ফ্যামিলির লোক জানতই না এ লোকের বিয়ে হয়েছে, ভাবত ন্যালাখ্যাপা লোক, বিয়ে থা করবে না, ঘরের কোণে শেয়ার বাজার ডিলিং করে জীবন কাটিয়ে দেবে। এদিকে স্লিপার সেল চালিয়ে গেছে মনের আনন্দে। বাপ ছেলে মিলে আমাদের ইন্টেলিজেন্সকে ফাঁকি দিয়ে আধার ক্রেডিট হ্যাক করেছে, ইন্টারন্যাল সিকিউরিটিকে বোকা বানিয়ে সায়কের আই কার্ড নিয়ে একটা ছেলেকে ক্যারিয়ার হিসেবে ইউজ করে কাশ্মীরে, দিল্লিতে ব্লাস্ট করিয়েছে, মুম্বইতেও করাত, কানের পাশ দিয়ে বেরিয়েছে, অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আপাতত প্লেন হাইজ্যাক করিয়েছে। জাস্ট... জাস্ট ভাবা যাচ্ছে না। কী ডিমাক্ত আছে কে জানে"।

মাথুর বললেন "স্যার, ওই ছেলেটা, মানে যাকে ক্যারিয়ার হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, ইজ হি রিয়েলি ক্লিন?"

খান বললেন "ইয়েস, হি ইজ ক্লিন। আমি কথা বলেছি। ছেলেটার বাড়ির ঠিকুজি কুষ্ঠী সার্চ হয়ে গেছে। নির্বিবাদ ছেলে, এখনও বেকার, পাড়ার মোড়ে আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কোন দোষ নেই"।

তুষার বললেন "ওরা এই ছেলেটাকেই টার্গেট করল কেন?"

খান কাঁধ ঝাঁকালেন "সর্ষের মধ্যেই ভূত। ফ্রিকেন্দের একজামে ওকে আমাদের লোকজন হেঁটেছিল। ওরা ওকে পছন্দ করেছিল। সিম্পল"।

তুষার মাথায় হাত দিলেন, "মাই গড! তার মানে আমাদের ভেতরেই ওদের ইনফর্মার আছে"!

মাথুর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তুষারের ফোন বেজে উঠল। তুষার ফোনের স্ক্রিণটা দেখে বললেন "রেহান"।

ধরলেন তুষার, ফোনটা স্পিকার মোডে রাখলেন "বল রেহান। আপডেট দাও"।

"স্যার, ওরা হাসান মাকসুদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। ভিডিও কলিং করাতে বলছে। আধ ঘন্টা সময় দিয়েছে, নইলে বলছে একজন একজন করে মারতে শুরু করবে। বলছে দশজন শিশু আছে, আগে তাদের মারবে"।

মাথুর খানের দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "ব্লাডি সান অফ... ওকে। ওদের কাছে কাল ভোর অবধি সময় চাও। বল হাসানের ব্যাস হয়েছে। উনি টায়ার্ড ফিল করছিলেন। এখন শুয়েছেন"।

ওপাশে কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পরে উত্তর এল "স্যার এদিকে আরও প্রবলেম হয়েছে"।

"বলে ফেল"।

"শ্রীনগরে একটা আর্মি ক্যাম্পে হামলার চেষ্টা হয়েছিল। দুজন ছিল, দুজনই স্পট"।

তুষারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করল। মাথুরের দিকে তাকালেন। কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন "আর্মি বুঝে নেবে ওদের। আপাতত এয়ারপোর্টেই নজর দাও। সে আর ফ্রেঞ্জারাস।তুমি সময় চাও। কাল ভোর ছ'টা অবধি"।

ফোনটা কাটলেন তুষার। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি থেকে ফোন আসতে শুরু করল, ধরলেন তুষার "বলুন স্যার"।

"কী আপডেট তুষার?"

"স্যার ওরা হাসানের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে"।

"তো বলাও। প্রবলেম কী আছে?"

"স্যার, আমরা কাল ভোর অবধি টাইম চেয়েছি"।

"কেন? এখন কী প্রবলেম?"

তুষার একটু গলা খাকড়িয়ে বললেন "থার্ড ডিগ্রি দিতে হয়েছিল স্যার। এখন..."

"হোয়াট! কার পারমিশনে এটা করতে গেলে তুমি!"

তুষার কিছু বললেন না। ওপাশ থেকে মন্ত্রীর রাগী গলা ভেসে আসল "আমি কিছু জানি না, ওরা যা চায় এক্ষুণি মেটাও। কোন রিস্ক নিতে চাই না আমি। পি এম সাহাব বার বার ফোন করছেন আমায়। স্টেটস থেকে আপডেট জানতে চাইছে।

তোমার কাছে ফিফটিন মিনিটস আছে তুষার, ক্লিন দিস মেস আপ। আর না পারলে বল, আমি অন্য পথ দেখছি"।

ফোনটা কেটে গেল।

তুষার ফিসফিস করে একটা গালাগাল দিয়ে বললেন "যতসব। ঘরে বসে বসে জ্ঞান মেরে হিরো সাজবে"!

খান বললেন "হাসানের মুখে রক্ত ছিল ক্লিন করে মেডিসিন দেওয়া হয়েছে তো স্যার। আপনি কথা বলিয়ে দিন। যা হয় হবে"।

তুষার উত্তর দিলেন না। চায়ে চুমুক দিয়ে দেখলেন চা ঠান্ডা হয়ে গেছে।

৩৮।

জ্যোতির্ময় কাঁচের ফাঁক দিয়ে ইয়াসমিনকে দেখছিলেন। পায়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে গেছে। ওষুধও পড়েছে। এখন মেঝেতে শুয়ে আছেন ইয়াসমিন। জ্যোতির্ময়ের ফার্স্ট এইড করা হয়েছে। ঘর ভর্তি ওষুধের গন্ধ।

"কেমন আছেন আপনি?"

খান ঢুকলেন ঘরে।

জ্যোতির্ময় স্বগতোক্তি করলেন "এসে গেল ছোট টিকটিকি"।

খান বললেন "কিছু বললেন?"

জ্যোতির্ময় বললেন "না, আপনিও কি মারধোর করতে এসেছেন?"

খান চেয়ারে বসলেন "আমার নাম আশরাফ খান"।

জ্যোতির্ময় বললেন "হ্যাঁ, দিল্লি চাণক্যপুরী বসন্ত বিহারে রিসেন্টলি একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। স্ত্রী আর বোন থাকে। মা গ্রামের বাড়ি সেকেন্দ্রাবাদে থাকেন। আপনার এক ভাই স্কুলে পড়ান, নামটা... ফিরদৌস খান। ঠিক তো?"

খান কয়েক সেকেন্ড জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন "একদম ঠিক। আর এই ডিটেলগুলো দিয়ে আপনি আমাকে যা বোঝাতে চেয়েছেন তাও বুঝেছি"।

জ্যোতির্ময় বললেন "একজন মুসলমান হয়ে আপনি এ দেশের হয়ে কাজ করছেন? লজ্জা করে না আপনার?"

খান বললেন "একজন হিন্দু হয়ে আপনি মুসলমান হয়েছেন আপনার লজ্জা লাগে না তো আমার কেন লাগবে?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আমি যা ইচ্ছা হতে পারি, আমার সে ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে"।

খান শিস দিয়ে উঠলেন "সে তো এই দেশে। মিডল ইস্টের কোন কান্ট্রিতে মুসলমান ফ্যামিলিতে জন্ম নিয়ে একবার খ্রীস্টান হয়ে দেখবেন তো! তখন না হয় আপনার ব্যক্তিস্বাধীনতার গল্প শুনব"।

জ্যোতির্ময় খানের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললেন "এই দেশ মুসলিমদের তাদের মত করে বাঁচতে দিচ্ছে না। আপনার মনে হয় না প্রতিমুহূর্তে দমন পীড়ন চলছে আমাদের ওপর?"

খান বললেন "তো? আপনার কী? আপনি কে? হাতিম ভাই? আপনি তো ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে, কনভার্টেড মুসলিম"।

জ্যোতির্ময় বললেন "এই উপমহাদেশের কোথায় কোথায় কনভারসান আছে। আপনার ফ্যামিলি ইতিহাস দেখুন, হয়ত আপনার ফ্যামিলিও আগে হিন্দু ছিল"।

খান মাথা নাড়লেন "সরি বস। আমাকে বর্তমান নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকতে হয় যে অতীতে কী হয়েছিল, বাবর কী করেছিল, ইব্রাহিম লোদীর হারেমে কত মেয়েমানুষ ছিল তা নিয়ে আমি একটুও চিন্তিত নই"।

জ্যোতির্ময় বললেন "আপনি চিন্তিত না হতে পারেন। ওরা তো চিন্তিত"।

খান বললেন "ওরা কারা?"

জ্যোতির্ময় বললেন "যারা মসজিদ ভেঙে মন্দির করতে চায়"।

খান বললেন "দেখুন জ্যোতির্ময়বাবু কিংবা হাসান, আপনাকে আমি খুব ভাল করে একটা কথা বোঝাই। আমার মগজ ধোলাইয়ের চেষ্টা করবেন না। আমাকে আমার চাকরিটা করতে দিন। আর বাই দ্য ওয়ে, আমি বিশ্বাস করি না, কোন একটা দুটো পলিটিক্যাল পার্টির জন্য এ দেশটা আর আমার থাকবে না। আপনি টেগোরের দেশের লোক, আপনার অন্তত টেগোরে ভরসা রাখা উচিত ছিল"।

জ্যোতির্ময় বললেন "কী করব? ভরসা? বাহ, ভাল কথা বলেছেন তো! গুজরাটে যখন গর্ভবতী মেয়ের পেটে ওরা তলোয়ার চালিয়েছিল আপনি কোথায় ছিলেন? কাশ্মীরে যখন বাড়ি থেকে মেয়েদের বের করে নিয়ে ধর্ষণ করা হত আপনি কোথায় ছিলেন?"

খান বললেন "কিংবা ডাইনোসররা যখন অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল তখন আমি কোথায় ছিলাম, তাই না?"

জ্যোতির্ময় জ্বলন্ত চোখে খানের দিকে তাকালেন।

খান বললেন "মগজধোলাইটা কীভাবে হল আপনার? কে করেছে? এত ইন্সপিরেশন পেলেন কোথেকে?"

জ্যোতির্ময় চুপ করে থাকলেন।

খান বললেন "কী লাভ হয় এসব করে বলুন তো? হিরো হওয়া যায়? সত্যিই কি হওয়া যায়? এই যে লাদেন, বিরাট আনন্দে টুইন টাওয়ারটা ভাঙল। কী লাভ হল? সেই তো কুকুরের মত মরতেই হল! যাক গে, কাজের কথায় আসি। বলুন কী চান?"

জ্যোতির্ময় বললেন "আমি চাই না। কাশ্মীর চায়"।

খান বললেন "পাকিস্তানে যাবেন? কী দেবে পাকিস্তান কাশ্মীরকে? ওপারের কাশ্মীরের সঙ্গে কখনও এপারের কাশ্মীরের তুলনা করেছেন?"
জ্যোতির্ময় খানের দিকে তাকিয়ে বললেন "আজাদি চাই। আজাদ কাশ্মীর চাই।
আর্মির পাহারা চাই না, স্বাধীনতা চাই। মায়েদের ইজ্জত ফেরত চাই"।
খান মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন "ওকে। ফাইন। চেয়ে দেখ করেন। তা কতদিন আজাদি রাখতে পারবেন? লস্করের জানোয়ারগুলো যখন আম কাশ্মীরিদের ঘর থেকে মেয়েদের টেনে নিয়ে যাবে তখন বাঁচাতে আসবেন তো?"
জ্যোতির্ময়ের চোখদুটো একবার জ্বলেই নিভে গেল। বললেন "সেটা আমরা বুঝে নেব"।
খান বললেন "বেশ। তাই হোক। বুঝে নেবেন। কিন্তু আপনি তো মশাই বাঙালি ব্রাহ্মণ। আপনার হঠাৎ কাশ্মীরের জন্য অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল কেন?"
জ্যোতির্ময় উত্তর দিলেন না। খান পকেট থেকে মোবাইল বের করে রেহানকে ফোন করলেন। রেহান ফোন ধরলেন।
খান বললেন "কানেক্ট কর। কথা বলুক"। খানিকক্ষণ পরেই খানের মোবাইলে মীর্জার মুখ ভেসে উঠল।
মীর্জা বললেন "কেমন আছেন স্যার?"
জ্যোতির্ময় বললেন "বাচ্চা ও মহিলাদের ছেড়ে দাও"।
মীর্জা বললেন "কিন্তু..."
জ্যোতির্ময় বললেন "সকালে ফোন করব। ঘুমাব এখন"।
খানের দিকে তাকালেন জ্যোতির্ময়। ফোনটা কাটলেন খান। জ্যোতির্ময় খানের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন "আপনাদের তুষার স্যারকে বলে দিন, আর পনেরো মিনিটের মধ্যে এখান থেকে বের করে নিয়ে আমার ওয়াইফকে হসপিটালাইজড না করলে হেলি রোডের ফ্ল্যাটে ওর ফ্যামিলির লোকজনের একজনও বেঁচে থাকবে না। এটা আমার শপথ। আপনি এখন আমাকে ঘুমাতে দিন। খুদা হাফেজ"।
খান চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৩৯।

আফসানা রাগী চোখে মীর্জার দিকে তাকিয়ে বললেন "ব্যস! হয়ে গেল"।
মীর্জা বললেন "কী হয়ে গেল?"
আফসানা বললেন "আমি তো এই ভয়গুলোই পাই। আমাদের কী কথা ছিল? হোস্টেজদের ছেড়ে দেওয়ার কথা একবারও হয়েছিল? আরমানে উনি ভড়কেছেন"।
মীর্জা গম্ভীর মুখে বললেন "হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে উনি যা বলবেন আমি তা

করব"।

আফসানা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন "এই দেখো, কীভাবে আর্মি চারদিকে এসে জড়ো হয়েছে। আমাদের উলটোটা করা উচিত। মহিলা শিশুদের রেখে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া। এতজন পুরুষের মধ্যে কেউ উলটো বাহাদুরি দেখিয়ে দিলে বিপদটা বেশি"।

মীর্জা চিন্তিত মুখে আফসানার দিকে তাকালেন "আর যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে?"

আফসানা বললেন "ছেড়ে দাও"।

মীর্জা উঠে কেবিনের বাইরে গেলেন। বীরেন বলল "আমাকে ছেড়ে দিন ম্যাম। আমি আর পারছি না বিশ্বাস করুন"।

আফসানা হাসতে হাসতে বললেন "তাই নাকি? তোমাকে ছেড়ে দেব? আর তুমি বাইরে বেরিয়ে বলবে আফসানা এদের সঙ্গে যুক্ত আছে? তা হয় নাকি?"

বীরেন বলল "আপনি সব পুরুষ যাত্রীদের ছেড়ে দেবেন, আর আমাকে রেখে দেবেন তাহলেও ওদের সন্দেহ হবে না?"

আফসানা বললেন "হবে না। বরং ওরা বুঝবে তুমি আমাদেরই লোক"। বীরেন একটু চুপ করে থেকে বলল "আপনাদের লোক হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। যারা টেররিজম ছাড়া আর কিছু করতে পারে না, মানুষ মারা ছাড়া যাদের জীবনে আর কোন কাজ নেই, তাদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না। আর আপনি_ যত কম বলা যায় ততই ভাল। আপনার মত মানুষেরা মানবতার শত্রু"।

আফসানা বললেন "দেশের জন্য যাদের লড়তে হয় তারা মানবতার শত্রুই হয়। যে আমেরিকানদের তোমরা পুজো কর, সেই আমেরিকানরা যখন হিরোশিমা নাগাসাকি করল তখন তো কেউ কিছু বলল না! কারণ যে শক্তিশালী, সেই ঠিক। বাকি সবাই ভুল। ইন্ডিয়া এখন শক্তিশালী, বাকি বিশ্বের আড়ালে থেকে কাশ্মীরীদের ওপরে অত্যাচার করছে। ইন্ডিয়া ঠিক। এভাবে তো চলতে পারে না"। বীরেন বলল "আর পাকিস্তান ঠিক? জন্তুর মত লুকিয়ে এসে নিরীহ মানুষজনের মেরে বাহাদুরি দেওয়া খুব বীরত্বের কাজ বুঝি? আর যে এত বড় বড় কথা বলছেন, ভেবেছেন আমরা কিছুই জানি না? আপনাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ না খেতে পেয়ে থাকে। আপনাদের নেতারা ব্যস্ত থাকে অস্ত্র কিনতে, ইন্ডিয়ার এগেইনস্টে কনপিরেসি করতে"।

আফসানা বললেন "সে তোমাদের দেশের নেতারাও তাই করে। ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া থেকে অস্ত্র কেনে আর তা থেকে কাটমানি খায়। পাবলিককে বোকা বানিয়ে রাখার জন্য ইন্ডিয়া পাকিস্তান তাস তুলে ধরে। ভোটের আগে একটা কার্গিল, একটা অনিশ এগারো করে দিতে পারলেই বেরোজগারি, না খেতে পাওয়া, গ্রাম কে গ্রাম বিনা ইলেক্ট্রিসিটিতে চলা, সব ঢাকা পড়ে যায়। মেইন ইস্যু হয়ে যায় পাকিস্তান,

মেইন ইস্যু হয়ে যায় হিন্দু মুসলমান, কিংবা কিছু পলিটিশিয়ানদের জন্য গরু খাওয়া, শুয়োর খাওয়া। ভেবো না এগুলো আমি জানি না। আমরা সব জানি। কিন্তু আমাদের জন্য কান্ট্রি ফার্স্ট। দেশের ইন্টারেস্টের জন্য যতদূর যাওয়া দরকার, আমি যেতে রাজি"।

দরজা খুলে সুমন ঢুকল। বোঝাই যাচ্ছে বেশ রেগে আছে। আফসানাকে বলল "এটা কী হচ্ছে? এটা তো কথা ছিল না!"

আফসানা অবাক হয়ে বললেন "কী হচ্ছে? কী কথা ছিল না?"

সুমন বলল "আমার বাবা যা বলেছে তা হচ্ছে না কেন? শিশু আর মহিলাদের কেন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না?"

আফসানা ঠান্ডা গলায় বললেন "কারণ এই সিচুয়েশনে আমি যা বলব তাই হবে। তোমার বাবার মত ইন্ডিয়ান পুলিশের অতিথেয়তা নিচ্ছি না বলে!" সুমন হাতের রাইফেলটা আফসানার মাথায় ঠেকাল। পরক্ষণেই নামিয়ে নিল। আফসানা হাততালি দিলেন জোরে জোরে, "বাহ বাহ। গুলিটা একবারে চালিয়েই দাও। আমার কিছু হলে তোমাদের আর এখান থেকে বেরোতে হবে না"। সুমন নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল "বাবা যা বলেছে তাই হবে"। আফসানা সুমনের চোখে চোখ রেখে বললেন "না, আমি যা বলব তাই হবে"।

৪০।

মিনি শুয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না। একটা দুঃস্বপ্নের মত দিনটা যাচ্ছে। যে জেঠুকে সে ছোটবেলা থেকে একভাবে দেখে এসেছে, যে লোকটার কোলে পিঠে মানুষ হয়েছে, তারই সম্পূর্ণ অন্য রূপ তাকে একেবারে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

একটা লোক এতটা অভিনয় করে একটা বাড়িতে থাকতে পারে? এত নির্লিপ্তভাবে থাকতে পারে? মাঝে মাঝেই জেঠু থাকত না, তাদের বলে যেত ঘুরতে যাচ্ছে, বাবা কাকা আক্ষেপ করে বলত দাদার লাইফটা কত ভাল, একা মানুষ কোন পিছুটান নেই, যেদিকে ইচ্ছা চলে যেতে পারে। সে লোকটা আসলে কোথায় যেত? মিনির মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। মোবাইলে চার্জ ছিল না। তার ফেসবুক খুলতে ইচ্ছা করল।

বিছানা থেকে উঠে মিনি কম্পিউটার খুলল।

ফেসবুক ছেয়ে গেছে প্লেন হাইজ্যাকিঙের খবরে। কেউ প্রার্থনা করছে, কেউ সন্ত্রাসবাদীদের গালাগালি করছে। বিভিন্ন তরজা চলছে নানা লোকের ওয়ালে। মিনির খুব লজ্জা লাগছিল। মনে হচ্ছিল সেও আসলে ওই সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যেই কেউ একজন, যার বাড়ির লোক সন্ত্রাসবাদী, সেও তো আসলে সন্ত্রাসবাদীই হয়।

আফসানা সাইদের জন্য নানা রকম প্রার্থনা শুরু হয়েছে। আফসানা সাইদের বিভিন্ন পোস্ট শেয়ার হচ্ছে। একজন নারী, যিনি ধর্মীয় বন্ধন ঠেলে , রাষ্ট্রকে দূরে সরিয়ে রেখে মেয়েদের কষ্ট নিয়ে কলম ধরেছেন, তার এরকম অপহরণের ঘটনায় স্বভাবতই ইন্টারনেট উত্তাল হয়ে উঠেছে।

মিনি স্ক্রল করতে করতে দেখে যাচ্ছিল শুধু। মেহজাবিন অনলাইন ছিল। তাকে দেখে পিং করল "এই"।

মিনি লিখল "বল"।

"কী রে! সেই লিফলেটের ব্যাপারটাই সত্যি হল তবে!"

"তাই তো দেখছি"।

"আমি কাউকে কিছু বলি নি, তুই কিছু বলিস নি তো কাউকে"?

"না না, টপ সিক্রেট। ক্ষেপেছিস"?

"কী বাজে ব্যাপার বল?"

"হুঁ"।

"আফসানা সাইদের যদি কিছু হয় খুব খারাপ লাগবে রে। উনি আমার আইডল"।

"হু। আমারও"।

"তিন তালাক নিয়ে আফসানার একটা রিসেন্ট উপন্যাস বেরিয়েছিল। পড়েছিস?"

"কোনটা বলত?"

"তালাক, তালাক, তালাক। আমার কাছে আছে, পড়িস। জাস্ট ফাটাফাটি"।

"আচ্ছা পড়ব। তুই এখনো জেগে আছিস কেন ব্যাটা?"

"হি হি। সাদিক অনলাইন"।

"ওওও। আচ্ছা। কথা বল। আমি কাটি"।

"বাই। গুড নাইট"।

"গুড নাইট"।

ব্রাউসারটা বন্ধ করে মিনি কম্পিউটারটা শাট ডাউন করল। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে মেশিনটা শাট ডাউন হতেই হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত তার একটা কথা মনে পড়ল।

সে আবার মেশিনটা অন করল। বুট হচ্ছিল মেশিনটা, মিনি ধৈর্য ধরে রাখতে পারছিল না। যতক্ষণ মেশিনটা অন হচ্ছিল, মিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করা শুরু করে দিল। বুট হতেই সে লাফিয়ে গিয়ে ব্রাউসার অন করে জিমেল খুলল। যেটা খুঁজছিল সেটা পেতেই নিজের ঘর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। বাবা মা ঘুমাচ্ছিল, মিনি বলল "তোমরা ওঠো শিগগিরি ওঠো"।

সোমেন, অনিন্দিতা সবে ঘুমিয়েছিলেন, মিনির কথায় ধড়মড় করে উঠে বললেন "কী হল? কী হয়েছে?"

মিনি হাঁফাচ্ছিল। অনিন্দিতা বললেন "দম নিয়ে নে"।

মিনি বলল "দম নিলে হবে না, শোন্‌, আগের মাসের ঘটনা, জেঠু হঠাৎ করে আমার ঘরে এসে বলল একটা ইমেল করতে হবে। আমার জিমেলটা খোলাই ছিল। জেঠু তাড়াতাড়ি বসে ইমেলটা করেই উঠে গেছিল। এই জাস্ট মনে পড়ল। আমি ভেবেছিলাম জেঠু হয়ত মেইলটা ডিলিট করে দিয়েছে, এখন দেখলাম করে নি। ভাবতেই পারে নি হয়ত এরকম দিন আসতে পারে। অসাবধানে..."

সোমেন উত্তেজিত গলায় বললেন "কী লেখা মেইলে? দেখলি?"

মিনি বলল "লেখা আছে ডিস্ট্রিপ ফোটোর সময় হয়ে গেছে। গেছে ব্লু ফ্লাওয়ার অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল অ্যাড্রেসে"।

সোমেন বললেন "ওরা তো ফোন নাম্বার দিয়ে গেছে, আমার ফোনটা দে, এক্ষুণি ফোন করে জানাই"।

সোমেন ফোন করলেন। কয়েক সেকেন্ড কথা বলে ফোনটা রেখে বললেন "ওরা একটা ইমেল অ্যাড্রেস পাঠাচ্ছে। মেইলের স্ক্রিনশট নিয়ে সেন্ড কর"। সোমেনের ফোনে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইমেল অ্যাড্রেসের এস এম এসটা ঢুকল। মিনি ফোনটা নিয়ে নিজের ঘরে দৌড়ে গেল।

মেইলটা স্ক্রিনশট নিয়ে পাঠিয়ে কী মনে হল ব্লু ফ্লাওয়ার লিখে গুগল সার্চ করল। ব্লু ফ্লাওয়ার আফসানা সাইদের প্রথম বইয়ের নাম।

৪১।

ইয়াসমিনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ট্রেচার এসে গেছিল। কয়েকজন নার্সও এসেছিলেন। জ্যোতির্ময় পাশের ঘর থেকে সেটা দেখছিলেন। হঠাৎ দেখলেন তুষার এসে কিছু বলছেন নার্সদের। নার্সরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তুষার পাশের ঘর থেকে তার ঘরে এসে জ্যোতির্ময়কে বললেন "আমরা দুঃখিত হাসান, আপনার স্ত্রীকে হসপিটালাইজড করা গেল না"। জ্যোতির্ময় রাগী গলায় বললেন "আমি কি জানতে পারি, কেন?"

তুষার বললেন "আপনার সঙ্গীরা আপনার কথা শোনে নি, পুরুষদের ছেড়ে দিয়েছে, মেয়েদের ছাড়ে নি, যেখানে উল্টোটা হওয়া উচিত ছিল। নিরীহ নারী আর শিশুদের আপনারা হোস্টেজ করে রেখে দিলেন। সুতরাং..."

জ্যোতির্ময় জ্বলন্ত চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তুষার জ্যোতির্ময়ের সামনের চেয়ারে বসলেন "দ্রোণাচার্য আর একলব্যের গল্পটা জানেন তো? মানুষের বুড়ো আঙুলটা খুব ইম্পরট্যান্ট হাসান। এই যে আপনি এত ভাল ভাল ইনোভেটিভ বোমগুলো বানাচ্ছেন, জাস্ট ভাবুন তো, আপনার বুড়ো আঙুলটাই নেই! আপনি বানাতে পারতেন সেগুলো? তাছাড়া এই বুড়ো বয়সে বা

হাতের বুড়ো আঙুলটা না থাকা খুব একটা ভাল ব্যাপার হবে না। will it be easy to clean your ass with four fingers Mr. Hassan?"

জ্যোতির্ময় কিছু বললেন না।

তুষার উঠে বেরোলেন ঘর থেকে। কন্ট্রোল রুমে ঢুকতেই মাথুর উত্তেজিত গলায় বলল "স্যার মেয়েটা ফোন করেছিল"।

তুষার ভ্রু কুঁচকালেন "কোন মেয়েটা?"

মাথুর বললেন "ল্যাট রিলেটিভ অফ হাসান"।

তুষারের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, "স্যাড ইন্টেলিজেন্ট ব্রেভ গার্ল। কী বলছে?"

মাথুর কম্পিউটারের মণিটরটার দিকে আঙুল দেখালেন "দেখুন স্যার, এই মেইলটা করেছিল হাসান। সম্ভবত ভাবতেও পারে নি কস্মিনকালেও কেউ সন্দেহ করবে। আইপিও দেখে নি। এখন কী মনে হতে দেখতেই এটা পেয়েছে। আমাদের স্ক্রিনশট তুলে পাঠিয়ে দিয়েছে। মেইলটাও ফরোয়ার্ড করেছে"।

তুষার অস্ফুটে বললেন "শাবাশ। দিস ইজ গ্রেট। টিউলিপ... টিউলিপ ইজ আ কাশ্মীরী ফ্লাওয়ার মাথুর। খান, কী মনে হচ্ছে তোমার?"

খানের ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল বলে খান ব্ল্যাক কফি খাচ্ছিলেন। ঘুমচোখে বললেন "স্যার হ্যাকার লাগবে"।

তুষার অবাক হয়ে বললেন "মানে"?

খান বললেন "হাসান যাকে মেইলটা পাঠিয়েছে তার আইডিটা হ্যাক করতে হবে"।

মাথুর খানের দিকে তাকিয়ে বললেন "মাথা গেছে?"

খান বললেন "এছাড়া কোন উপায় আছে? বুল্লাওয়ার কার আইডি, খায় না মাথায় দেয় কী করে বুঝব?"

তুষার কয়েক সেকেন্ড খানের দিকে তাকিয়ে বললেন "রাইট। আইটির কে আছে কলকাতায়?"

খান বললেন "পীযূষ গোয়েল। বাড়িতে ঘুমাচ্ছে এখন"।

তুষার বললেন "গাড়ি পাঠিয়ে দাও। ফোন কর। আধ ঘন্টার মধ্যে এখানে হাজির কর"।

খান উঠে ঘরের বাইরে গেলেন। মাথুর বললেন "দ্য থিং ইজ গেটিং কমপ্লিকেটেড স্যার"।

তুষার বললেন "কেন?"

মাথুর বললেন "পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। কাশ্মীরিদের ওপর ভারতের প্রচুর অন্যায় অবিচার হচ্ছে, রাষ্ট্রসংঘে ওরা নাকি এই নিয়ে ঝড় তুলবে। আফসানা সাইদ পাকিস্তানের সম্পদ, তার কিছু হলে পাকিস্তান ছেড়ে কথা বলবে না এটসেট্রা"।

তুষার বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন "এমনই সম্পদ যে মহিলাকে দেশের ধর্মীয় ষণ্ডগুলোর জন্য দেশ বিদেশে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। রাস্কেল কান্ট্রি একটা। টেররিজম ছাড়া কিছু শেখায় না। তুমি জানো না মাথুর, বাস্টার্ডদের কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না"।

মাথুর বললেন "সায়ক ডাউন হবার আগে খানিকটা আঁচ আমরা পেয়েছিলাম স্যার। যে দেশের আর্মিই সে দেশের পলিটিশিয়ানদের কন্ট্রোলে থাকে না, তাদের থেকে আর কী এক্সপেক্ট করা যায়? মুজফফরাবাদে রীতিমত টেররিজমের চাষ হয়"।

তুষার মাথা নাড়ালেন "সায়ক ওয়াজ অ্যান অ্যাসেট। লোজ বাস্টার্ডস কিলড_"

তুষারের ফোন বাজছিল। রেহান ফোন করছেন। তুষার ধরলেন "বল রেহান"।

"স্যার কয়েকটা ইম্পরট্যান্ট ইনপুটস দেওয়ার জন্য ফোন করছি"।

"বল"।

"ওরা তিনজন আছে। তিনজনই খোরা ফেরা করছে। আফসানাকে পাইলট কেবিনে রাখা হয়েছে। সঙ্গে ওই ছেলেটিও আছে"।

"ওকে"।

"কোন ইনস্ট্রাকশন স্যার?"

তুষার একটু চুপ করে থেকে বললেন "শার্প অ্যাটাক রেডি রাখো রেহান"।

রেহান অবাক হলেও সেটাকে বুঝতে না দিয়ে বললেন "ওকে স্যার। আপনাকে আপডেট দিয়ে যাব"।

তুষার বললেন "ইজ শ্রীনগর ওকে?"

রেহান বললেন "ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। কালকেও বৃষ্টি হবে। লালচকে প্রোটেস্ট র‍্যালি হতে পারে কাল। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট বলছে অনন্তনাগে বড় সড় ঝামেলা বাধাবে কাল। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ পোড়াতে পারে_"

তুষার বললেন "ওকে। আপাতত এসব নিয়ে তুমি ভেবো না। আমি কাল যেতে পারি। না গেলেও, তোমার ওপর অনেকগুলো দায়িত্ব থাকবে। আশা করি নিরাশ করবে না"।

রেহান বললেন "বাচ্চাগুলোকে রেখে দিয়েছে স্যার। এরা মানুষ না"।

তুষার বললেন "জানি। রাখছি এখন। পরে কোন আপডেট এলে ফোন কোর"।

"জয় হিন্দ স্যার"।

"জয় হিন্দ"।

তুষার ফোনটা কাটলেন।

খান হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন, "পীযূষ ইজ হিয়ার স্যার"।

তুষার ঘড়ি দেখে বললেন "হাফ অ্যান আওয়ার বলেছিলাম। ইউ টুক টুয়েন্টি ফাইভ মিনিটস। ইম্প্রেসিভ"।

পীযূষ ঢুকলেন ঘরে। তুষার দেখলেন পীযূষকে ঘরের থ্রি কোয়ার্টার আর টি শার্টেই তুলে নিয়ে এসেছেন খান।

৪২।

রাত দেড়টা।

মেজর জেনারেল অবস্তী গম্ভীর মুখে ঢুকলেন শ্রীনগর এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে। রেহান খানকে দেখেই ডাকলেন "কোন আপডেট রেহান?"

রেহান বললেন "স্যার, তুষার স্যার ফোন করে বললেন শার্প শুটার রেডি করতে"। অবস্তী রেহানের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন "ওকে, আর কিছু? লালচকের ঝামেলার কথা জানিয়েছ?"

রেহান বললেন "হ্যাঁ স্যার, এখানেই কনসেন্ট্রেট করতে বললেন"। পরক্ষণেই হেসে ফেলল "আর বললেন শ্রীনগরটা আপাতত আর্মি দেখুক"।

অবস্তীর বিরক্তির সঙ্গে বললেন "তা তো হবেই। আর্মি তো এই করবে। মার খাবে, মরবে, আত্মরক্ষা করতে গেলে শুনতে হবে আর্মি খারাপ! ড্যাম উইথ দ্য সিস্টেম! আর কী যে করছে রঙ্গনাথন কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা মক্কা তো ধরা পড়েছে! এখনও ডিসিশন নিতে পারছে না কেন?"

রেহান বললেন "দিস কেস ইজ লাইক ক্যান্সার স্যার। কতটা ছড়িয়েছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না তো! কী করবেন বলুন? এই মুহূর্তে অপারেশনে গেলে... মানে যাওয়ার তো কোন চান্সই নেই"।

অবস্তী গম্ভীর গলায় বললেন "হু। যাদের ছাড়া হয়েছে তাদের সবাই এয়ারপোর্ট লিভ করেছে?"

রেহান বললেন "না বেরোতে দেওয়া হয় নি সিকিউরিটি রিজনসের জন্য। ভোরবেলা ছাড়া হবে। তাছাড়া, কয়েক জনের ফ্যামিলিও আছে। তারা তো এমনিতেও কোথাও যাবে না।"

অবস্তী বললেন "পাইলট আর এয়ার হোস্টেসদের রেখে দিয়েছে? তার মানে আবার কোন প্ল্যান আছে নাকি?"

রেহান মাথা নাড়লেন "বলতে পারব না স্যার। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না"। অবস্তী বললেন "প্যাসেঞ্জার লিস্টটা চেয়েছিলাম তখন। আনিয়ে নাও"।

রেহান পকেট থেকে ওয়াকি টকিতে ফোন করে প্যাসেঞ্জার লিস্টটা দিয়ে যেতে বললেন।

অবস্তী রেহানের দিকে তাকালেন "তুমি কাশ্মীরি না?"

রেহান বললেন "হ্যাঁ স্যার"।

অলক্তী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "তোমরা ভয় করো না? ওরা তো তোমাদেরই বেশি টার্গেট করে এখন"।

রেহান বললেন "সেটাই করছে স্যার এখন প্রতিমুহূর্তে। আম কাশ্মীরিদের মধ্যে যারা ইন্ডিয়ান আর্মিতে আছে তাদের টার্গেট করছে। ওরা চায় না আমাদের মধ্যে কেউ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের চাকরি করুক"।

অলক্তী হাসলেন "হ্যাঁ, তার পরিবর্তে কতগুলো রাইফেলধারী জেহাদী হোক। দিস হোল থিং ইজ এ জোক রেহান, তুমি বুঝতে পারো? ওরা কন্টিনিউয়াসলি প্রভোক করে যাবে, আর আমাদের দেশের একেকটা সরকার তাতে একেকরকম রিঅ্যাক্ট করবে। অথচ কাজের কাজ কিছু হবে না। গোটা রাজ্যটা বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে"। অলক্তী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

রেহান বললেন "জানি স্যার, তাই তো আমি এখনও নিজেকে ইন্ডিয়ান বলেই মনে করি, যতই পলিটিক্যাল প্রভোকেশন থাকুক না কেন ওপারে কিংবা এপারে"।

অলক্তী রেহানের কাঁধে হাত রাখলেন "জানি রেহান, ডেমোক্রাসিতে সবই মেনে নিতে হয়। পার্সোনালি আমিও কাশ্মীরে যে দমন নীতি চলছে তা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারি না। কাশ্মীর হল একটা ফুলের মত, আমরা সে ফুলটাকে দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট করে ফেলছি"।

রেহান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন একজন প্যাসেঞ্জার লিস্টটা দিয়ে গেলেন তাকে। রেহান লিস্টটা অলক্তীকে দিলেন।

অলক্তী লিস্টটা মন দিয়ে দেখলেন। মিনিট পাঁচেক পর বললেন "রেহান, লিস্টটা তুষারকে পাঠাও। ওর হয়ত এত কিছুর মধ্যে এটা মাথায় নাও থাকতে পারে"।

রেহান বললেন "ওকে স্যার"।

মোবাইল বের করে ফটো তুলে রেহান ফটোগুলো তুষারকে পাঠিয়ে দিলেন। অলক্তী বললেন "হাই সিকিউরিটি লোকজনদের নিয়ে এই সমস্যা। একজনের জন্য গোটা প্লেনটাকেই..."

রেহান বললেন "আফসানা সাইদকে তো ওরা টার্গেট করবেই স্যার। কাশ্মীর কিংবা পাকিস্তানে মেয়েদের ওপরে হয়ে চলা সমস্ত রকম অত্যাচারের প্রতিবাদী মুখ যখন"।

অলক্তী বললেন "তুমি আফসানার লেখা পড়েছ?"

রেহান মাথা নাড়লেন "সময় কোথায় স্যার"?

অলক্তী বললেন "আমি পড়েছি, লেখার কোয়ালিটি কিন্তু ট্রাশ। বিরাট কিছু না। তবে সাবজেক্টগুলো যেহেতু অ্যান্টি পাকিস্তান, আমাদের দেশের লোক তাতেই খুশি"।

রেহান বললেন "গাটস থাকা দরকার কিন্তু স্যার, ডেমোক্রাসি ইন পাকিস্তান ইজ অ্যান ইম্পসিবল টার্ম"।

অনন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন "সেম ইন কাশ্মীর রেহান। এখানেও আমরা ডেমোক্রসি দিতে ব্যর্থ"।
রেহান হাসলেন "দ্য গুড থিং ইজ স্যার, এই কনফেশনটা আমরা এদেশে খুলে আম করতে পারব। পকিস্তানে সেটাও পারব না"।
অনন্ত হাসলেন "রাইট"।

৪৩।
রাত আড়াইটা।
"চা খাবেন? আমার কাছে টি ব্যাগ আছে। আপনি চাইলে খাওয়াতে পারি"।
জ্যোতির্ময়ের ঘরে ঢুকলেন তুষার। জ্যোতির্ময় চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন। চোখ খুললেন না।
তুষার জ্যোতির্ময়ের সামনের চেয়ারে বসলেন। টেবিলে তবলা বাজাতে শুরু করলেন। শব্দ শুনে জ্যোতির্ময় চোখ খুললেন। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ইয়াসমিনকে দেখলেন। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে শুয়ে পড়েছেন ইয়াসমিন।
তুষার বললেন "চা খাবেন?"
জ্যোতির্ময় ক্লান্ত গলায় বললেন "এখানে কি আমাকে পিকনিক করতে নিয়ে এসেছেন অফিসার?"
তুষার বললেন "না, একবারেই সে দাবী আমি করছি না, কিন্তু এখানে যেহেতু আপনি আমার গেস্ট, তাই আপনি পিকনিক করবেন না কাবাডি খেলবেন সেটা আমিই ঠিক করব, তাই না?"
জ্যোতির্ময় বললেন "আমি কিছু খাব না"।
তুষার বললেন "আপনার ওয়াইফের উচ্চ ইনজেকশন করা হয়েছে, কাল সকালে হসপিটালাইজড করা হবে। ইন্ডিয়ায় ডেমোক্রসি আছে, আমরা চেষ্টা করলেও জেহাদীদের মত হতে পারি না। বুঝেছেন?"
জ্যোতির্ময় বললেন "তা বটে, ক্যামেরার সামনে একজন সংখ্যালঘুকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে পারেন, গরুর মাংস খাচ্ছে অভিযোগে ট্রেন থেকে নামিয়ে গণপ্রহারে
মেরে ফেলতে পারেন, ডেমোক্রসি আছে বটে। ঠিকই বলেছেন"।
তুষার বললেন "কয়েকজন সাইকোর জন্য গোটা দেশবাসীকে দায়ী করাটা কি ঠিক হল? আমি নিজে তো বিফ খাই, আমার তো কোন প্রবলেম হয় না"!
জ্যোতির্ময় তুষারের দিকে তাকিয়ে বললেন "রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন জোরে জোরে চেঁচিয়ে, আমি বিফ খাই?"

তুষার বললেন "তার কোন প্রয়োজন আছে কি? আপনিই বলুন না, আছে কি? আমি কি খাব না খাব, সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটা যেমন কেউ এসে বলে দেবে না, একই ভাবে আমি আমার অন্দরমহল খুলে দেখাব কি না সেটাও আমার ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করছে। বাদ দিন মিস্টার মাকসুদ, আমি খানিকটা আপনার মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছি। কয়েকটা পয়েন্ট যোগ করছি নিজের থেকেই, আমি ভুল হতে পারি। বলে ফেলি?"

জ্যোতির্ময় চুপ করে থাকলেন।

তুষার বললেন "আচ্ছা ধরেই নিলাম আপনার চুপ করে থাকাটা সম্মতির লক্ষণ। শুনুন তবে, প্রথমত আপনি বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মেছেন। বাঙালি ব্রাহ্মণরা দক্ষিণ ভারতীয় বা উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণদের মত অতোটা গোঁড়া না হলেও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্টই গোঁড়া। আপনার ভালোবাসা হল একজন মুসলিম মহিলার সঙ্গে ,আপনি আলাদা সংসার করলেন বাড়িতে লুকিয়ে। সে সংসারের কথা বাড়িতে বললেন কিন্তু আপনার মা মানলেন না কিছুতেই। মারা গেলেন দুঃখে। ফ্রাস্ট্রেশনে। আপনি ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করলেন এবং একসময়ে এসে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলেন। কিন্তু ক্যাসিয়াস ক্লে যে শান্তির খোঁজে মহম্মদ আলী হয়েছিলেন আপনি সেই খোঁজে মোটেও আসেন নি। আপনার ছিল রাষ্ট্রের প্রতি, নিজের পরিবারের প্রতি এক সীমাহীন রাগ। সেই রাগ আপনাকে ধীরে ধীরে একটা চক্রের মধ্যে প্রবেশ করাল..."

জ্যোতির্ময় বিরক্ত গলায় বললেন "আহ, চুপ করুন তো, কিছু না জেনে নিজের মত করে একগাদা কথা বলেই চলেছেন আপনি। আপনি কিচ্ছু জানেন না"।

তুষার বললেন "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি বুঝেছি আপনি আমাকে অনেক কিছুই বলতে চাইছেন না জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ওরফে হাসান মাকসুদ ওরফে মোজাম্মেল করিম"।

জ্যোতির্ময় স্থির চোখে তুষারের দিকে তাকালেন।

তুষার বলে চললেন "ইয়াসমিন বেগম, নোয়াখালী, তাই তো? নিজের বাড়ি দেখতে যাওয়ার আজ্ঞুহাতে গিয়ে ওদেশেই ইয়াসমিন বেগমকে প্রেম করে বিয়ে করলেন, প্রথম সন্তানকে নিয়ে এদেশে অবৈধভাবে ঢোকার সময় বি এস এফের গুলিতে প্রথম সন্তানকে হারালেন, এমনই ভাগ্যের পরিহাস বাচ্চাটার সৎকারও করতে পারলেন না, গুলি খাবার পর ওই পেট্রাপোল নো ম্যান্স ল্যান্ডের বাদাবনেই ছেলের লাশ ফেলে রেখে এদেশে চলে আসতে হয়েছিল। অতঃপর কলকাতার এক মুসলিম মহল্লায় ঘর নেওয়া এবং সুমনের জন্ম... একই সঙ্গে জন্ম ভারতবর্ষের প্রতি তীব্র ঘৃণার। বাড়িতে ছিলেন ঠিকই কিন্তু এমনভাবে থাকতেন কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে

পারে নি আসলে আপনি কী করে বেড়াচ্ছেন। এবারে ঠিক বলছি তো আমি শ্রী জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য?"

জ্যোতির্ময় দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন।

তুষার টেবিলে কয়েকটা টোকা মেরে বললেন "ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স মিস্টার হাসান মাকসুদ কিংবা নোয়াখালীর মোজাম্মেল করিম, দেড় ঘন্টার মধ্যে আপনার ঠিকুজি কুষ্ঠী বার করে নিয়েছে। এবার বলুন, আফসানা সাইদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কী করে? কবে থেকে আপনারা একসঙ্গে কাজ করছেন এবং আমাদের সব ইন্টেলিজেন্সকে চুতিয়া বানিয়ে যাচ্ছেন?"

জ্যোতির্ময়ের শোক পলকের মধ্যে বিস্ময়ে পরিণত হল, তিনি বিস্ফারিত চোখে তুষারের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৪৪।

রাত সাড়ে তিনটে।

মীর্জা এসে বীরেনকে বললেন "বাইরে যান, আমাদের কথা আছে"।

বীরেন কেবিনের দরজা খুলে বাইরে গেল।

মীর্জা বললেন "বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিলে ভাল হত। ভীষণ কান্নাকাটি করছে। এভাবে ঝামেলা বেড়ে গেল"।

আফসানা বললেন "বাচ্চারা কান্নাকাটি করবেই। কিন্তু এটা তুমি ভুলে যাচ্ছ, গভর্নমেন্ট এই বাচ্চাদের জন্যই অনেক বেশি আমাদের দাবী মেনে নেবে"।

মীর্জা অধৈর্য গলায় বললেন "আমরা তো এখনও আমাদের দাবী জানাতেই পারলাম না"।

আফসানা বললেন "জানিয়ে দাও। বলে দাও শ্রীনগর জেল থেকে ওমর শেখকে ছেড়ে দিতে। খবর পেলে সেফ প্যাসেজ চেয়ে নাও। তুমি সুমন আর সহিল বেরিয়ে যাও। আমি থেকে যাব মেয়ে আর বাচ্চাদের সঙ্গে। একখানা ইন্টারভিউ দিতে হবে এই যা"।

মীর্জা হতাশ গলায় বললেন "শুধু ওমর শেখকে ছেড়ে দিতে বলব? হাসান মাকসুদকে না?"

আফসানা ঠান্ডা গলায় বললেন "অবাস্তব কথা বলবে না মীর্জা। তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। উনি ফ্যামিলি শুদ্ধ ধরা পড়েছেন। উনি তো বলেইছিলেন ওকে নিয়ে চিন্তা না করতে। আমাদের মধ্যে ডিল হয়েছিল উনি হাইজ্যাকিংটা করাবেন, আমি ওমর শেখকে ছাড়িয়ে দেব। ডিল কমপ্লিট।এখন আর এত প্রশ্ন আসছে কেন?"

মীর্জা বললেন “উনি কিন্তু বাচ্চা আর মেয়েদের ছেড়ে দিতে বলেছিলেন”।
আফসানা কাঁধ ঝাঁকালেন “সিচুয়েশন ওয়াইজ ডিসিশন চেঞ্জ হতেই পারে। কী বল? হতে পারে না?”
মীর্জা বললেন “ওকে। আমি জানিয়ে দিচ্ছি। আর ওই ছেলেটার কি হবে?”
আফসানা বললেন “এত বড় হাইজ্যাকিং হবে একটাও লাশ পড়বে না তা কি হয়? একমাত্র ওই আমার স্বরূপ জানে। আশা করি আর বলতে হবে না কী করতে হবে!”
মীর্জা কয়েক সেকেন্ড আফসানার দিকে তাকিয়ে বললেন “জি”।
আফসানা বললেন “আর ওই কী যেন নাম, মাকসুদের ছেলে! ওকে বলে দিও বেশি বাড়াবাড়ি না করতে। নইলে এর পরে যখন পাকিস্তান যাবে, তখন স্রেফ জ্যান্ত কবর দিয়ে দেব”।
আফসানার চোখদুটো জ্বলে উঠল।

৫

“আর ইউ সিরিয়াস রেহান?” অনন্ত অবাক চোখে রেহানের দিকে তাকালেন।
রেহান বললেন “ইয়েস স্যার। অনলি ওমর শেখ”।
মেজর জেনারেল অনন্ত আরও কিছুক্ষণ রেহানের দিকে তাকিয়ে বললেন “হু ইজ দিস ওমর শেখ?”
রেহান বললেন “লাস্ট ফেব্রুয়ারিতে কাশ্মীর টাইমসের এডিটর হুসেনকে মার্ডার করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছিল।”
অনন্ত বললেন “হু”।
অনন্ত ফোন বের করে তুষারকে ফোন করলেন। কয়েকটা রিং হতে ধরলেন তুষার, বললেন “বলুন অনন্ত”।
অনন্ত বললেন “শুধু একজন ক্রিমিনালের জন্য এত বড় অর্গানাইজড হাইজ্যাকিং। ইজ ইট বিলিভেবল তুষার?”
তুষার হাসলেন “হি হ্যাজ আ হিস্ট্রি অনন্ত। আফসানা সাইদের এককালের হাসব্যান্ড ওমর শেখ। মহিলা এক কাজে দু কাজ করছেন”।
অনন্ত বললেন “মাই গড! জাস্ট বাচ্চা আর মেয়েদের জন্য যুদ্ধ করতে পারছি না তুষার। আপনি বুঝতে পারছেন না আমরা কী হেল্পলেস সিচুয়েশনে আছি। বাই দ্য ওয়ে, প্যাসেঞ্জার লিস্টটা দেখেছেন?”
তুষার বললেন “ওসব দেখে কী হবে, ছেড়ে দিয়েছে তো সবাইকে”।
অনন্ত বললেন “হু। আজব কান্ড। পুরুষদের ছেড়ে দিয়েছে, মেয়েদের আটকে দিয়েছে”।

তুষার বললেন "আজকের কিছু নেই। হাইজ্যাকাররা খুব বেশি জন নেই তো। ওরা পুরুষদের নিয়ে কোন রিস্ক নিতে পারে নি"।

অন্তরী বললেন "আচ্ছা রাখছি। আপডেট দিতে থেকো। জয় হিন্দ"।

তুষার বললেন "জয় হিন্দ"।

ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ তুষার বসে রইলেন। মাথুর চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। টেবিলে মাথা রেখে শুয়েছেন খান। পীযূষকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছে। কী মনে হতে মোবাইলটা হাতে নিয়ে তুষার প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখা শুরু করলেন। কয়েক মিনিট দেখার পর ফিসফিস করে বললেন, "টিউলিপ ফোটার সময় হয়ে এসেছে"। এর পরেই জোরে জোরে বললেন "শিট। শিট শিট"।

তুষার জোরে জোরে পা ফেলে জ্যোতির্ময়কে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সে ঘরে এলেন। জ্যোতির্ময় চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন। তুষার এসেই জ্যোতির্ময়কে এমন জোরে ঠেললেন যে জ্যোতির্ময় চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। তুষার ঝুঁকে পড়ে জ্যোতির্ময়ের কাঁধ জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন "টিউলিপ ফোটার সময় মানে কী! বলুন বলুন?"

জ্যোতির্ময় হাসতে শুরু করলেন "মেরে ফেলুন আমাকে অফিসার, আমার কাজ হয়ে গেছে, আর বেঁচে থেকে কী হবে"।

তুষার জ্যোতির্ময়ের মুখে জোরে একটা ঘুষি মারলেন। জ্যোতির্ময় মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

জামার হাতা গোটাতে গোটাতে তুষার ইন্টারোগেশন রুম থেকে বেরিয়ে অন্তরীকে ফোন করলেন, রিং হতেই ফোনটা তুললেন অন্তরী, "আপডেট এল?"

তুষার হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন "যাদের প্লেন থেকে নামিয়েছে তারা এখনও বেরোয় নি তো?"

অন্তরী অবাক গলায় বললেন "না কেন বলুন তো?"

তুষার বললেন "প্রত্যেকের বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন করার লোক পাঠাচ্ছি। তার আগে মেক শিওর যেন কেউ এয়ারপোর্ট লিভ করতে না পারে"।

৪৫।

ভোর চারটে পনেরো। মাথুর এবং খান দুজনেই ঘুমোচ্ছেন। মাথুর বেশ জোরে নাক ডাকছেন।

তুষার বসে ছিলেন। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক ধরণের প্রাণায়াম করবেন ভাবছিলেন, কিন্তু হার্ট বিট এতটাই বেড়ে যাচ্ছিল যে সেটুকুও করতে পারছিলেন না।

ফোন বাজতে শুরু করল, তুষার দেখলেন দিল্লি থেকে কেউ ফোন করছেন, ধরলেন "ইয়েস স্যার"।

"প্রাইম মিনিস্টার স্পিকিং"।

তুষার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন "ইয়েস স্যার"।

"আফসানা সাইদ সম্পর্কে আপনারা শিওর?"

"হান্ড্রেড পারসেন্ট স্যার"।

"হু। ওমর শেখকে ছেড়ে দেবার ডিসিশন নিয়েছ শুনলাম"।

"ইয়েস স্যার। ওদের সেফ প্যাসেজ দেওয়া হবে"।

"স্টিল দ্য হোল থিং ইজ লুকিং ইললজিকাল। আপনি বুঝতে পারছেন তুষার আমি কী বলতে চাইছি?"

"বুঝতে পারছি স্যার। দ্য হোল থিং ইজ নট ইললজিকাল। দে হ্যাভ ইভেন আ বিগার প্ল্যান"।

"হোয়াট প্ল্যান?"

"সেটা সম্পূর্ণ কনফার্ম হবার পরেই আপনাকে বলতে পারব, এখনই বলতে পারছি না, এক্সট্রিমলি সরি স্যার"।

"ওকে, আই শ্যাল নট ডিস্টার্ব ইউ। বাট আই অ্যাম অ্যাওয়েক। কিপ মি পোস্টেড"।

"শিওর স্যার। জয় হিন্দ"।

"জয় হিন্দ"।

ফোনটা রেখে তুষার কাঠের টেবিলে ঠক ঠক করে শব্দ করতে লাগলেন। খানের ঘুম ভেঙে গেল। মাথুর নাক ডেকে যাচ্ছিলেন। খান উঠে বললেন "সরি স্যার। আর পারা যাচ্ছিল না"।

তুষার বললেন "নো প্রবলেম। টেক রেস্ট। প্রয়োজন পড়লে আমি ডেকে দেব"। খান বললেন "স্যার আপনি মনে হচ্ছে কোন কিছুর অপেক্ষা করছেন"। তুষার বললেন "হ্যাঁ খান, টিউলিপ ফোটার। টিউলিপ গার্ডেন গেছো কোনদিন?"

খান বললেন "না স্যার। কোন দিন যাওয়া হয় নি"।

তুষার বললেন "যেও ফ্যামিলি নিয়ে কোন দিন। পৃথিবীর সুন্দরতম বাগানগুলোর মধ্যে একটা। যখন সব ঝড় থেমে যাবে, তখন, যেও"।

খান হেসে ফেললেন।

তুষার বললেন "হাসছ কেন?"

খান বললেন "আপনি তো কবি হয়ে গেলেন স্যার"!

তুষার বললেন "আই ইউজড টু রাইট পোয়েম হোয়েন আই ওয়াজ ইয়ং। প্রথমে এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম, খাতা ভর্তি করে কবিতা লিখতাম"।

খান চোখ বড় বড় করলেন "রিয়েলি স্যার?"

তুষার বললেন "রিয়েলি। হাইপোথেটিক্যাল সেসব কবিতা। চাঁদ নেমে আসবে মাটিতে, সূর্য তোমার খোঁপায় বসবে, সে কী সব ভাষা! বড় হয়ে নিজেই সে সব নষ্ট করে ফেলেছিলাম। জাস্ট অকওয়ার্ড মোমেন্ট"। তুষার হেসে ফেললেন। খানও হাসলেন।

তুষার বললেন "কবিতা এক অদ্ভুত জিনিস তুষার। প্রতিটা লাইনে কত আবেগ মাখা থাকে! সবাই লিখতে পারে না। এই, বাঙালিরা খুব ভাল কবিতা লিখতে পারে। তুমি গীতাঞ্জলী পড়েছ খান?"

খান ঘাড় নাড়লেন "ইয়েস স্যার"।

তুষার বললেন "সোনার খনি। টেগোরের দেশের লোক মানুষ মারবে, কী আনফরচুনেট না?"

খান বললেন "দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ চেঞ্জিং স্যার। কোরাপ্ট পলিটিশিয়ান্স, কোরাপ্ট পলিসির জন্য দিনে দিনে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। আমার বাবা..." খান ইতস্তত করে চুপ করে গেলেন।

তুষার বললেন "কী বলছিলে বল"।

খান বললেন "লাস্ট উইক, আমার বাবা মসজিদ থেকে ফিরছিলেন, তিন চারটে ছেলে বাইকে করে যাচ্ছিল, বাবার টুপিটা ছিনিয়ে নিল, বুড্ঢা পাকিস্তান চলে যা, এসব বলে চলে গেল। আমি ওয়াইফের থেকে শুনলাম, রাগ হচ্ছিল, তার থেকেও বেশি হচ্ছিল দুঃখ। আমরা সাতপুরুষের ইন্ডিয়ান। এরকম কথা ভাবতেও পারি নি কোন দিন। আমাদের চেনা দেশটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত"। তুষার দুঃখিত মুখে খানের দিকে তাকিয়ে বললেন "এর কারণ কী জানো খান? ল্যাক অফ এডুকেশন। যে দেশে বিজ্ঞান সেকেন্ড অপশন হয়ে যায়, সেদেশে এসব অবশ্যম্ভাবী। হবেই। আর যত মেরুকরণ হবে, একটা ধর্মকে যত কোণঠাসা করে দেওয়া হবে, তত বাড়তে থাকবে টেরোরিজম। কাঁহাতক তারা এত কষ্ট সহ্য করতে করতে টিকে থাকবে? স্টেটের এপেইন্সটে সে রুখে দাঁড়াবেই। দিস হোল সিস্টেম নিডস টু বি রেক্টিফায়েড ইমিডিয়েটলি। নইলে সামনে আরও ভয়ংকর দিন আসছে"। খান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তুষারের ফোন বেজে উঠল।

তুষার তুললেন "বল রেহান"।

"স্যার, পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। এদের কারও আই কার্ডের সঙ্গে বায়োমেট্রিক আইডেন্টিফিকেশন মেলেনি। ফটো পাঠাচ্ছি এদের"। ওপাশ থেকে রেহানের উত্তেজিত গলা ভেসে এল।

তুষার বললেন "রেহান, কাল সরি, দিন তো পড়েই গেছে, আজকের দিনের বৈশিষ্ট্য কী?"

রেহান কিছু একটা কাতরান ওপাশ থেকে।

তুষার জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন "শিট!!! শিট!!! আমার এতক্ষণ লাগল এটা বের করতে?"

তুষারের জোরে চেঁচানোতে মাথুর ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ মুছতে মুছতে বললেন "কী হল কী হল? পাকিস্তান ইন্ডিয়া অ্যাটাক করে ফেলল নাকি?"

তুষার উত্তেজিত গলায় বললেন "এতক্ষনে গোটা ব্যাপারটা ক্লিয়ার হল! উফ! আমার মাথাতেই আসে নি আসল কথাটা! তোমরা ঠিকই বল। আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। কাল হাসমত গিলানীর মৃত্যুবার্ষিকী। ছয় আগস্ট। গত বছর এই দিনেই আমি ওকে মেরেছিলাম। ওরা তার বদলা নেবে বলেই এত প্রস্তুতি করেছে। কোন এক অজানা কারণে গিলানীর ডাকনাম ছিল ব্লু টিউলিপ"।

মাথুর আর খান অবাক হয়ে তুষারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

৪৬।

সুমন কেবিনে ঢুকে বলল "কী প্ল্যান হল শেষ পর্যন্ত?"

মীর্জা একবার আফসানার দিকে তাকিয়ে বললেন "ওমর শেখকে শ্রীনগর জেল থেকে পাঠানো হচ্ছে চপারে করে। আমি তুমি আর সাহিল ওকে নিয়ে মুজফফরাবাদ রওনা দেব। সেফ প্যাসেজ দেওয়া হবে"।

সুমন উত্তেজিত ভাবে বলল "উনি যাবেন না?"

মীর্জা মাথা নাড়লেন।

সুমন বলল "কেন জানতে পারি?"

আফসানা বললেন "কারণ আমি তোমাদের মত টেররিস্ট নই। আমিও একজন হোস্টেজ। ওমর শেখকে পেয়ে তোমরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ। সিম্পল"।

সুমন মীর্জার দিকে তাকালেন "একদম নয়। আমরা ওকে নিয়ে যাব। আমি এই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে বিশ্বাস করি না। সেফ প্যাসেজ কেন দিতে যাবে আমাদের? চপার শুদ্ধ উড়িয়ে দেবে। পাকিস্তানও তো সেম জিনিস করতে পারে। আগে পৌঁছব তারপর ওখানে ওকে ছাড়ব"।

আফসানা জ্বলন্ত চোখে সুমনের দিকে তাকালেন।

মীর্জা আফসানার দিকে ঘুরলেন "আই ফাইন্ড লজিক..."

আফসানা বললেন "এটা কিন্তু ডিল ছিল না মীর্জা"।

সুমন বলল "ডিল সব কিছু থাকে না তো! সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান চেঞ্জ হয়। আপনার কথা অনুযায়ী তো মেয়েদের ছাড়া হল না। এটাও সেরকমই ভেবে নিন"।

আফসানা সুমনের দিকে আঙুল তুলে বললেন "আই অ্যাম নট টকিং টু ইউ। জাস্ট শাট দ্য ফাক আপ"।

সুমন রেগে গেল "এই শালী, কী রে, তখন থেকে বড় বড় বুকনি ঝেড়ে যাচ্ছিস, কে তুই? তোর আউকাতই বা কী তোর? বেঁচেই তো আছিস মির্জার ওপর বেস করে। একদম গলা নামিয়ে কথা বল নইলে তোর আসলিয়ত গোটা পৃথিবীকে বলে দেব মনে রাখবি"।

সুমন কথা বলতে বলতে আফসানার দিকে তেড়ে যাচ্ছিল। মীর্জা সুমনকে আটকালেন। আফসানা কড়া চোখে মীর্জার দিকে তাকিয়ে বললেন "মীর্জা এই অসভ্যতা কিন্তু আমি বরদাস্ত করব না। টেল হিম। টেল হিম নাও"।

মীর্জা সুমনের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে তর্জনী ঠেকালেন। আফসানার দিকে ফিরে বললেন "করবে না, বুঝতে পারছেন না, আপনি তো শিক্ষিত মানুষ! এতক্ষণ নার্ভ ধরে থাকা যায়?"

আফসানা বললেন "সব যায়, জলে নামলে পা ভেজাতেই হবে, এখন নার্ভ ঠান্ডা রাখবে না গরম রাখবে সেটা আমার জানার দরকার নেই। টেল হিম টু রেসপেক্ট মি"।

সুমন চেঁচিয়ে বলল "রেসপেক্টের গাঁড় মারি। ইয়ার্কি হচ্ছে এখানে? উনি বড় বড় বাতেলা মারবেন, টিভিতে বাইট দেবেন, আর আমরা কুত্তার মত এখানে সেখানে লুকিয়ে মরব? আমার বাবা পুলিশের মার খেয়ে মরবে? শোন মীর্জা, ওই মাগীকে বলে দাও, আমাদের সঙ্গে এল ও সি পর্যন্ত গিয়ে তারপরে ওর ছুটি, নইলে কোন ডিল হবে না"।

আফসানা তীক্ষ্ণ রেগে গেলেন, "মীর্জা, শুট হিম"।

মীর্জা অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন "কী বলছেন ম্যাম?"

আফসানা বললেন "আই সেইড শুট হিম!"

সুমন প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে তাক করল আফসানার দিকে। মীর্জা সুমনকে জোরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বললেন "কী হচ্ছে কী? জাস্ট গেট আউট অফ দ্য কেবিন। গো"।

সুমন কয়েক সেকেন্ড আফসানার দিকে আগুনে চোখে তাকিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

আফসানা বললেন "ব্লাডি আনকালচারড সোয়াইন"।

মীর্জা ঠান্ডা গলায় বললেন "তবে ওর কথায় যুক্তি আছে। আপনি আমাদের সঙ্গে মুজফফরাবাদ যাচ্ছেন"।

আফসানা মেঝেতে জোরে পা ঠুকে বললেন "জাহান্নুম মে যাও!"

#

বীরেন প্লেনের সিটে বসে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর্মি ঘিরে ফেলেছে গোটা জায়গাটা। প্লেনের ভেতরে কয়েকটা বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ এখনও কাঁদছে। সব মিলিয়ে একটা দম বন্ধকরা পরিস্থিতি। সুমন কেবিন থেকে উত্তেজিত অবস্থায় বেরিয়ে তার পাশে এসে বসে পড়পড়িয়ে বাংলায় খিস্তি মারতে শুরু করল।

বীরেন বুঝতে পারছিল সুমন উত্তেজিত হয়ে আছে। সে কাঠি হয়ে বসে রইল।

৪৭।

ভোর পাঁচটা-

১) ফকরুদ্দিন আহমেদ,

২) জামাল খান

৩) মিনহাজুদ্দিন আনসারি

৪) ইসমাইল আব্বাস

৫) পঙ্কজ বানশাল ওরফে পারভেজ হাসান।

এ্যারফোরসের সেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এদের। একটা বদ্ধ ঘরে হাত পা বেঁধে চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

অবন্তী লিস্টে চোখ বুলিয়ে বললেন "ব্রিফ ইন্ট্রো প্লিজ"।

রেহান বললেন "ফকরুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশী। চট্টগ্রামে বাড়ি। জামাত ইসলামী থেকে হাতেখড়ি। পরে মুজফফরাবাদ থেকে আর্মস ট্রেনিং নেয়। হি ইজ আ টেরিফিক এক্সপার্ট অফ মেকিং বম্বস। ছোট জিনিস বানাতে পারে, বড় ধামাকা করার ইন বর্ন ট্যালেন্ট আছে। জামাল খান, সেম পিঞ্চ। বাংলাদেশী। তবে এর স্পেশালিটি গ্রেনেডে। মিনহাজুদ্দিন আনসারির বাড়ি ইউ পিতে। আইটি স্পেশালিস্ট। হ্যাকার। একই সঙ্গে টাইমবোম মেকিং এ এই মুহূর্তে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। ইসমাইল আব্বাস করাচীর ছেলে। লস্করের সঙ্গে এই তিনের লিংক ম্যান।

পঙ্কজ বানশাল একসময়ে কট্টর হিন্দু ছিল। হঠাৎ করে কনভার্ট হয়ে যায়, কী কারণে হয় এখনও আমাদের ইন্টেলিজেন্সের কাছে খবর নেই। এই তিনের উইকেস্ট মেম্বার বলতে পারেন"।

অবন্তী বললেন "উইকেস্ট মেম্বার ভাল সুইসাইড বোম্বার হয় রেহান"।

রেহান মাথা নাড়লেন।

অনন্ত্রী বললেন "তাহলে এই প্ল্যান ছিল। এক ঢিলে দুই পাখি। একদিকে ওমর শেখ ছাড়া পাবে গিলানীর মৃত্যুবার্ষিকীতে, আর অন্যদিকে সেই একই দিনে এই দাগী জঙ্গীগুলো শ্রীনগরে ঢুকে আর্মি ক্যাম্পে হামলা করলে, কিংবা আরও বড় কিছু"।
রেহান বললেন "হ্যাঁ স্যার। আবসোলিউটলি। এরা ধারাভিতে লুকিয়ে ছিল মাস খানেক। আই কার্ড গুলো পাওয়া গেছে, সব ফেক"।
অনন্ত্রী বললেন "এরা তো আলাদা হয়েও আসতে পারত। একসঙ্গে এল কেন?"
রেহান বললেন "দে আর প্ল্যানিং সামথিং বিগ ফর দ্য ফোর্থকামিং ডেজ"।
অনন্ত্রী বললেন "এসব প্ল্যানিং কারা করে? অরগানাইজেশনের নাম জানা গেল?"
রেহান বললেন "আফসানা আর হাসান মাকসুদেরই হবে। অরগানাইজেশন নেম সম্পর্কে এখনও ধোঁয়াশা আছে। তবে ও দেশের ইনভলভমেন্ট আছে তো বুঝতেই পারছেন"।
অনন্ত্রী বললেন "তা তো থাকবেই? ওই শুয়োরদের কাজই বা কী? সেটা বড় কথা না, আমাদের ইন্টেলিজেন্সের কাছে কোন খবর ছিল না?"
রেহান অনন্ত্রীর দিকে তাকালেন "খবর নিতে গিয়েই তো সায়ক..."
অনন্ত্রী মাথা নাড়লেন "স্মার্ট ব্রিলিয়ান্ট ইয়ং ম্যান"।
রেহান অন্যমনস্কভাবে বললেন "উই ওয়্যার বেস্ট ফ্রেন্ডস। লিভ ইট স্যার, আপনি বলুন কালকে আপনার প্ল্যান কী আছে"।
অনন্ত্রী বললেন "জাস্ট টু স্টে অ্যালার্ট। হোয়াট এলস আই ক্যান ডু রেহান?"
রেহান বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন "নিজের দেশের লোক যদি আমাদের বিপক্ষে চলে যায় তবে কী করতে পারি বলুন?"
অনন্ত্রী শ্বাস ছাড়লেন "এখন আর আমাদের পিছনে ফেরার কোন উপায় নেইরেহান। উই হ্যাভ টু অ্যাক্ট। ব্যাপারটা যতই নির্দয় হোক না কেন!"
রেহান চুপ করে বসে থাকলেন।
কিছুক্ষণ পর বললেন "শার্প শুটার রেডি স্যার?"
অনন্ত্রী বললেন "ইয়েস ম্যান"।
রেহান বললেন "শ্রীকান্ত ভাস্করণ তো?"
অনন্ত্রী বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়লেন "শ্রীকান্ত নেই রেহান। ছুটিতে বাড়ি গেছে"।
রেহানের মুখ অন্ধকার হল "তবে?"
অনন্ত্রী বললেন "রামেশ্বর। রামেশ্বর কল। কাশ্মীরি পণ্ডিত। ওয়ান্স আপন আ টাইম..."
রেহান উদ্বিগ্ন গলায় বললেন "ইজ হি এক্সপার্ট?"
অনন্ত্রী মাথা নাড়লেন "নট লাইক শ্রীকান্ত, বাট উই হ্যাভ টু টেক চান্স"।

রেহান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন "লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট স্যার"।

রেহানের ওয়াকি টকি সাড়া দিয়ে উঠল। রেহান কয়েক সেকেন্ড কথা বলে অবন্তীকে বললেন "স্যার, ওমর শেখকে নিয়ে চপার রওনা দিয়েছে। ওদের দাবী অনুযায়ী চপার পাইলট ওমরকে পাইলট সিটে বসিয়ে চলে যাবে"।

অবন্তী বললেন "আজ সান রাইজ কটায়?"

রেহান বললেন "ফাইফ ফিফটি ফাইভ স্যার"।

অবন্তী রেহানের দিকে তাকালেন "লেটস টক টু রামেশ্বর। চল"।

৪৮।

"জাতীয় সঙ্গীত তোমায় কি এফেক্ট করে আশরফ?"

তুষার হালকা গলায় প্রশ্ন করলেন।

খান বললেন "সব সময় স্যার। আপনি বিশ্বাস করবেন না স্যার, আমার যখনই বাড়ির জন্য মন খারাপ হয় আমি জাতীয় সঙ্গীত শুনি। এই একটা গান সব কিছু ভুলিয়ে দেয় স্যার। হিন্দু-মুসলিম, কাশ্মীর-গুজরাট-অপারেশন ব্লু স্টার সব"। তুষার বললেন "আমাদের বাড়িতে ফিফটিন্থ অগাস্ট কীভাবে পালন করা হত জানো? আমার গ্র্যান্ড পা ছিলেন নেতাজী সাপোর্টার। আমি দেখেছি তিনি ওই অশক্ত শরীরে যত দিন বেঁচে ছিলেন, আমাদের পাড়ার ক্লাবে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ওড়াতেন। বলতেন যে লোকটা দেশের জন্য সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারেন, তার মত বড় আর কেউ হতে পারেন না। আমরা সবাই মিলে জাতীয় সঙ্গীত গাইতাম। ভাবো খান, কাশ্মীরি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মরাঠি, সিন্ধি, বাঙালি, ওড়িয়া, বিহারী, তামিল, ঝাড়খণ্ডী, আসামী, সিকিমিজ, হায়দ্রাবাদী, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান, জৈন, বৌদ্ধ... সবার একটা দেশ। একটাই ফৌজ তাদের। এগিয়ে চলেছে ভারত স্বাধীন করতে। তারা ফেইল করল কী পাশ করল, কার কী যায় আসে খান? ওই একটা লোক সব ভুলিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের"।

খান বললেন "নেতাজী থাকলে দেশভাগ মানতেন স্যার?"

তুষার হাসলেন "পাশাপাশি থাকল তারা বহুদিন, কিন্তু ব্রিটিশ এসে তাদের ভাগ করে চলে গেল খান। মারামারি, কাটাকাটি, প্রতিটা সময়। রাজনীতির পাশা হয়ে গেল ধর্ম। আমি জানি না নেতাজী থাকলে মানতেন কী না কিন্তু ইন দিস প্রেজেন্ট সিনারিও, রিলিজিয়নের থেকে বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের কাছে আর কিচ্ছু নেই। পলিটিক্যাল পার্টি আসবে যাবে, কিন্তু মানুষ যতক্ষণ না প্রপারলি এডুকেটেড হবে,

তত্দিন ঘরে ঘরে হাসান মাকসুদ তৈরী হবে, পঙ্কজ বনশাল তৈরী হবে"।
খান বললেন "অলক্ষ্যে হাজ্বলে মনে পড়িয়ে দিলেন স্যার। আপনি কি নাস্তিক?"
তুষার বললেন "সেটা আমি নিজেও জানি না, কিন্তু এটা জানি, যে জাত ইতিহাসের থেকে ভবিষ্যতকে বেশি গুরুত্ব দেয়, সেই জাতকে দমিয়ে রাখা কারও সাধ্য নয়।
আনফরচুনেটলি, ইট ইজ নট হ্যাপেনিং ইন আওয়ার কান্ট্রি"।
খান বলেছেন "সত্যজিত রে-র একটা ফিল্ম আছে স্যার। একটা ব্রেইন ওয়াশিং মেশিনে সব মানুষের চিন্তা ভাবনা একমুখী করে দেওয়া হত। রিলিজিয়ান হচ্ছে সেই মেশিনটা। যেটা জ্যোতির্ময়কে হাসান মাকসুদ বানিয়ে দেয়, পঙ্কজকে পারভেজ বানিয়ে দেয়, কিংবা খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার করার অপরাধে গ্রাহাম স্টুয়ার্ট স্টেইনকে পরিবারশুদ্ধ পুড়িয়ে মারতে হয়"।

তুষার বললেন "সব থেকে আনফরচুনেট হল; টেগোর, রায়ের দেশে এক্সট্রিমিস্টের সংখ্যা বাড়ছে খান। চোখ বন্ধ করে থাকলে আরও বড় বিপদ আসবে। পকিস্তান হল এমন একটা দেশ যারা সরাসরি টেরোরিজম স্পনসর করে। অতীতে কিংবা সাম্প্রতিক কালেই দেখ, যতবার আমরা ওদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেছি, ওরা সুযোগ খুঁজে বেরিয়েছে, কীভাবে ধোকা মারবে। এই সময়ে যদি আমরা ইস্ট আর নর্থ ইস্ট বর্ডার পুরোপুরি সিল না করতে পারি তাহলে আজকের মত আরও অনেক দিন দেখতে হবে আমাদের"।
মাথুরকে ঠেললেন খান। মাথুর বিরক্ত গলায় বললেন "কী হল?"
তুষার গলা তুললেন "মাথুর পরের জন্মে যদি পাকিস্তানে জন্ম হয় তাহলে কী করতে তুমি?"
মাথুর কাকালেন "সুইসাইড স্যার"।
সবাই হেসে উঠলেন। তুষারের ফোন বাজতে শুরু করল।
তুষার দেখলেন পি এম ফোন করছেন।

৪৯।
মীর্জা প্রার্থনা সেরে উঠলেন। আফসানা গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন।
মীর্জা উঠে দাঁড়াতেই বললেন "ফিনিশ দ্য জব মীর্জা"।
মীর্জা অবাক গলায় বললেন "কোন জব?"
আফসানা বললেন "কিল দ্যাট বয়। হি নোজ এভ্রিথিং অ্যাবাউট মি"।
মীর্জা ঘাড় নাড়লেন। কেবিন থেকে বেরিয়ে দেখলেন বীরেন চুপচাপ বসে আছে। পাশে সুমন।

তাকে দেখেই সুমন বলল "কী হল? এখন আবার ওনার কী হুকুম হয়েছে?"
মীর্জা পুস্তু ভাষায় বললেন যাতে বীরেন বুঝতে না পারে "দেখো সুমন, এখানে সমস্যা তৈরী কোর না। মনে রেখো, আমরা এখন পাকিস্তানে যাব, এই মুহূর্তে ওর কথা না শুনলে ওখানে গিয়ে কিন্তু তোমার কপালে দুঃখ আছে"।
সুমন বলল "আগে এদেশ থেকে তো ঠিক ঠাক বেরোতে পারি"।
মীর্জা ঠান্ডা গলায় বললেন "প্যানিক কোর না। প্যানিক করার মত কিছু হয় নি। আমি জানি, এটা একটা ন্যাচারাল প্রসেস। কিন্তু এই মুহূর্তে আফসানাকে রাগানো উচিত হবে না"।

সুমন রাগে গজগজ করতে করতে বিমানের পেছনের দিকে রওনা দিল।
মীর্জা প্লেনে থাকা মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন "আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নেই, আমাদের দাবী সরকার মেনে নিয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা ছাড়া পেয়ে যাবেন"।
একটা স্বস্তির শব্দ ভেসে এল।
মীর্জা বীরেনের পাশের সিটে বসলেন "আপনার কাশ্মীর কেমন লেগেছে বীরেন?"
বীরেন মীর্জার কথার উত্তর না দিয়ে বলল "আমি কি জানতে পারি আমি ছাড়া পাব কী না?"
মীর্জা কয়েক সেকেন্ড বীরেনের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন "আপনাকে মেরে ফেলার অর্ডার আছে"।
বীরেন মীর্জার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। বলল "বেশ তো, তাহলে দেরী করছেন কেন?"
মীর্জা বললেন "মেহেমানদের মারার শিক্ষা কাশ্মীরিরা কোন দিন পায় নি বলে"।
বীরেন কী বলবে বুঝতে না পেরে কিছু বলল না।
মীর্জা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে আবার পাইলট কেবিনে ঢুকলেন।
আফসানা বললেন "কাজ হয়ে গেছে?"
মীর্জা বললেন "আমার একটা প্রপোজাল আছে"।
আফসানা বললেন "কী প্রপোজাল"?
মীর্জা বললেন "গোটা অপারেশনটা আমরা বিনা রক্তপাতে করেছি। এই ছেলেটাকে আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই। পরে দেখা যাবে কী করা যায় ওকে নিয়ে"।
আফসানা রেগে গেলেন "ইয়ার্কি হচ্ছে? যা বলছি তাই কর"।
মীর্জা নিজের কোমর থেকে রিভলভারটা বের করে আফসানার হাতে দিয়ে বললেন "আপনি মেরে দিন তবে। আমি পারব না"।

আফসানা জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন “বাহ! কী দারুণ প্ল্যান! আমি ওকে মারি, আর বাকিরা সবাই আমাকে দেখে নিক! আর তোমার কাশ্মীরি মেহমানদারী হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হল হে মীর্জা? এতদিন তো ছিল না!”

মীর্জা বললেন “ছেলেটা কাজের আছে। মৌলবীসাহেবের হাতে পড়লে উই ক্যান কনভার্ট হিম। তাছাড়া হাসান সাহেবের ওকে নিয়ে কোন ক্লিয়ার অর্ডার ছিল না। হি ক্যান বি ইউজড ফারদার”।

আফসানা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে কাঁধ ঝাঁকালেন “ওয়েল। তাই হোক। তবে মনে রেখো মীর্জা, সুমন কাজটা ঠিক করে নি। এর ফল ওকে ভুগতে হবে”।

বাইরে চপারের শব্দ পাওয়া গেল। পুব আকাশ ধীরে ধীরে লাল হতে শুরু করেছে। সুমন দরজা ঠেলে কেবিনে ঢুকল। বলল “চল। বেরোনো যাক”।

আফসানা বললেন “কালো কাপড় বাঁধো আমার মাথায়। আগে সব মেয়েদের প্লেন থেকে নামাও। ওরা যেন আমাদের ঘিরে থাকে। তারপরে তোমরা তিনজন আমাকে ঘিরে ধরে থাকবে। আমার মাথায় রিভলভার ধরে থাকবে”।

মীর্জা আফসানার কথা মত কাজ করলেন।

আফসানা বললেন “ওদের পাইলট প্লেন ছেড়ে চলে গেছে?”

মীর্জা বাইনোকুলার নিয়ে দেখে উল্লসিত গলায় বললেন “হ্যাঁ। ওদের পাইলট সিটে বসেছেন। ওয়েটিং ফর আস”।

আফসানা বললেন “সাহিলকে ডাকো। সিঁড়ি প্লেনের সঙ্গেই লাগানো আছে তো?”

মীর্জা বললেন “হ্যাঁ”।

আফসানা বললেন “টেল দোজ ব্লাডি সিকিউরিটি টু স্টে অ্যাওয়ে অ্যাটলিস্ট হান্ড্রেড মিটারস”।

মীর্জা ফোন বের করে রেহানকে ফোন করে আফসানার কথা মত শর্তটা বললেন।

আফসানা উঠলেন, “ছেলেটাকে ভেতরে নিয়ে এসো। সাহিলকে ডাকো”। মীর্জা গিয়ে বীরেনকে ডেকে নিলেন। আফসানা বললেন “আমরা এবার বেরোব। কোন চালাকি করার চেষ্টা কোর না বীরেন। আশা করি জানো, কী হতে পারে তবে”। বীরেন কিছু বলল না। আফসানা মীর্জার দিকে তাকালেন, “মহিলা এবং বাচ্চাদের লাইন দিয়ে বাইরে বের কর”।

৫০।

“রামেশ্বর, ভিজিবিলিটি কেমন?” অজাতী বাইনোকুলার চোখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তার সঙ্গে ব্লু টুথে কানেক্টেড আছেন তুষার। তুষার চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন ওপাশ থেকে।

রামেশ্বর স্নাইপারে চোখ রেখে বললেন “ক্লিয়ার স্যার”।

রেহান বললেন "ডোর খুলেছে। ওহ, শিট, ওরে হোস্টেজদের বের করছে আগে। ওদের মধ্যেই ঢুকে থাকবে ওরা"।
অন্ত্রীর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল। তুষার বললেন "শিট। অন্ত্রী, আরও তিনজন শুটার চাই"।
অন্ত্রী রেগে গেলেন "কী বলছ তুমি? খেপে গেছো? আগে বলবে তো!"
তুষার বললেন "আমি জানি অন্ত্রী, তুমি ইচ্ছা করলে সব পারো। জলদি কর, হাতে সময় নেই"।
অন্ত্রী রেহানের দিকে তাকালেন "তোমাদের স্যার বলছেন এই সিচুয়েশনে আমাদের আরও তিনজন শুটার চাই"।
রেহান বিস্মিত চোখে অন্ত্রীর দিকে তাকালেন, "এখন বলছেন? কোথায় পাবেন?"
অন্ত্রী রাগী গলায় বললেন "দেখছি! স্বাউ পাজি কলকাতায় বসে আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে!"
তুষার বললেন "ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম অন্ত্রী! ডু ইট নাও"।
অন্ত্রী ওয়াকি টকি অন করে নির্দেশ দিলেন। দু মিনিটের মধ্যে তিনজন জওয়ান স্নাইপার নিয়ে হাজির হলেন।
রেহান বললেন "ওরা পারবে?"
অন্ত্রী বাইনোকুলার নিয়ে প্লেনের দিকে দেখলেন, মহিলারা নামছেন, সঙ্গে শিশুরা। ভয়ার্ত তাদের চোখ।
অন্ত্রী জওয়ানদের দিকে তাকালেন "টেক ইওর পজিশন। রামেশ্বর, ওদের হেল্প কর"।
তুষার বললেন "শাবাশ অন্ত্রী। ইউ আর এ জেম! দেখা হলে তোমাকে নিজের হাতে ইডলি বানিয়ে খাওয়াব। শোন, রামেশ্বর পর পর দুটো শুট করবে। একটা আফসানা, আরেকটা ওর ঠিক পেছনে যে থাকবে তাকে। বাকি জওয়ানেরা স্ট্যান্ড বাই থাকবে। নাও টেল মি দেয়ার পজিশন"।
জওয়ানরা রাইফেল তাক করলেন। অন্ত্রী বললেন "মেয়েরা নেমে সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়েছে"।
তুষার রুদ্ধশ্বাসে বললেন "তারপর?"
মহিলাদের লাইন শেষ হতেই আফসানা দৃশ্যমান হলেন। তার মাথায় রিভলভার তাক করে নামছেন মীর্জা। মীর্জার সঙ্গেই সুমন নামছে। বীরেন তাদের মাঝখানে। সাহিল বীরেনের পিছনে।
তুষার বললেন "সিঁড়ি থেকে ওপারের ডিসট্যান্স কত?"
অন্ত্রী বললেন "আন্দাজ পঁচিশ ফিট"।

তুষার বললেন "ওয়াচ কেয়ারফুলি। বীরেনকে দেখে নাও। ফ্রেন্ড আউট হিম। দ্য বেস্ট থিং ইজ আফসানা জানে না ওর স্বরূপ আমরা জানি, তাই বুঝতেই পারছ তোমার কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না!"
অলাত্তী কঁকিয়ে উঠলেন " হ্যাঁ। খুব সহজ কাজ। শোন তুষার, বীরেনের যদি গুলি লেগে যায় তখন কী হবে? আমি গ্যারান্টি দিতে পারছি না কিন্তু"।
তুষার একটু থমকে বললেন "ডু ইওর ডিউটি। কী আর করা যাবে সেক্ষেত্রে!"
অলাত্তী তুষারের নির্দেশ সবাইকে শুনিয়ে দিলেন।
প্রত্যেকে নিজের জায়গায় রাইফেল তাক করে বসে রইলেন।

#

আফসানা প্লেনের বাইরে বেরিয়ে গলা নামিয়ে বললেন "বেশি তাড়াহুড়ো কোর না মীর্জা। তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। দ্যাট ব্লাডি ইন্ডিয়ান্স উইল নট গেট, আমি আছি। ইটস সো সুথিং। যে দেশটাকে আমি সব চেয়ে বেশি ঘৃণা করি, তাদের চোখের সামনে দিয়ে সবাইকে বোকা বানিয়ে চলে যাব, কেউ বুঝতেও পারবে না"।
মীর্জা চারদিকে তাকিয়ে বললেন "দেরী করবেন না, পা চালান"।
আফসানা বললেন "ধুস! মজা নেনে লো ইয়ার। উফ, কতদিন পর নিজের দেশে ফিরব। এখন মনে হচ্ছে তোমাদের ডিসিশনই ঠিক। ক'দিন মুজফফরাবাদে আরাম করে তারপর নতুন কোন ড্রামা করা যাবে"।
বীরেনের মাথা কাজ করছিল না। তার পিঠে ঠান্ডা ধাতব বন্দুকটা খোঁচা দিচ্ছিল। সে দেখল খানিক দূরে চপারে বসে আছে ওমর শেখ। তারা পৌঁছতেই এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাবার অপেক্ষায়।

#

তুষার বললেন "সিঁড়ির কোন পজিশনে আছে ওরা?"
অলাত্তী বললেন "মাঝ বরাবর"।
তুষার বললেন "স্পিকারে দাও"।
অলাত্তী ফোনটা স্পিকারে দিলেন"।
তুষার বললেন "রামেশ্বর"!
রামেশ্বর বললেন "ইয়েস স্যার"।
তুষার বললেন "আফসানা ভিজিবল?"
রামেশ্বর বললেন "ইয়েস স্যার"।
তুষার বললেন "আর পিছনের জন?"
রামেশ্বর বললেন "ইয়েস স্যার"।

তুষার এক সেকেন্ড থমকালেন। তারপর বললেন "শুট দেম"।
রামেশ্বরের স্নাইপার পর পর দুবার গর্জে উঠল।

#

সিঁড়ির মাঝ বরাবর নেমেছিল, এমন সময় বীরেন দেখল আফসানা আর্তনাদ করে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলেন। মীর্জা কিছু বোঝার আগে তিনিও। বীরেন কোন দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ির বাদিক থেকে সরাসরি মাটিতে ঝাঁপ দিল। মাটিতে গড়িয়ে গেল খানিকটা। বা হাতের ওপর পড়ার ফলে ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল সে।
সুমন এবং সাহিলকে লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয়েছিল কিন্তু সে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে তারা আবার প্লেনের ভিতর দৌড়ে ঢুকতে গেল।
পর পর চারটে গুলি তাদের পিঠে এসে লাগল।
সিঁড়ির মধ্যে গড়াতে গড়াতে লাশগুলি মাটিতে এসে পড়ল।
মহিলারা আতঙ্কে আর্তনাদ করে মাটিতেই বসে পড়েছিলেন।
ওমর চপার আকাশে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেন।
রামেশ্বর ওমরকে তাক করলেন। অবন্তী চেঁচালেন "ডোন্ট শুট হিম, চপার ভেঙে পড়লে মহিলারা মারা পড়তে পারেন। এয়ারফোর্স উইল গেট দ্যাট বাস্টার্ড"।
রামেশ্বর বন্দুক নীচে রাখলেন।
তুষার ওপ্রান্ত থেকে চেঁচাচ্ছিলেন "কী হল! কী হল বল!"
অবন্তী মেঝেতে বসে পড়ে ক্লান্ত গলায় বললেন "অপারেশন সানশাইন সাকসেসফুল তুষার। তোমার বীরেন ইজ স্টিল অ্যালাইভ"।

৫১।
"রেহান"।
"ইয়েস স্যার"।
"আপডেট দাও"।
"ওমর সারেন্ডার করেছে স্যার। ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন"।
"হা হা। গুড। বীরেনের কী খবর?"
"লাকি বয় স্যার। ঠিক সময়ে ঝাঁপটা না দিলে কী হত কে জানে! যাই হোক, ওকে ফার্স্ট এইড দেওয়া হচ্ছে"।
"গুড। দেখো, মিডিয়াতে যেন ওকে কিছুতেই এক্সপোজ না করা হয়। লাইফ রিস্ক হয়ে যেতে পারে ওর"।

"ডোন্ট ওরি স্যার। কোন চিন্তা নেই"।

"ওকে ওর বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা কর এখনই"।

"কপি দ্যাট স্যার। স্যার অবন্তী স্যার কথা বলবেন"।

"দাও"।

"হ্যালো তুষার?"

"ইয়েস স্যার"।

"ইন্ডলি পার্টি ভুলো না কিন্তু"।

"পাগল নাকি? কিছুতেই ভুলব না। তুমি ছাড়া কে এত স্মুদ অপারেশন করত অবন্তী? আচ্ছা, টেক রেস্ট, আমি এদিকে কাজ করি"।

"ভুল বললে তুষার"।

"কেন? ওহ্ ইয়েস, ইয়েস, ইন্ডিয়ান আর্মি ইজ নেভার অন হলিডে। রাইট। সরি স্যার"।

"জয় হিন্দ তুষার"।

"জয় হিন্দ"।

তুষার ফোনটা রাখলেন। পি এম কয়েক মিনিট আগেই ফোন করে কনগ্রাচুলেট করেছেন তাকে।

কয়েক মিনিট বসে তুষার রওনা হলেন জ্যোতির্ময়ের ঘরের দিকে।

জ্যোতির্ময় চোখ বন্ধ করে বসে ছিলেন।

তুষার ঘরে ঢুকে জ্যোতির্ময়ের সামনের চেয়ারে বসলেন।

জ্যোতির্ময় চোখ তুলে তুষারের দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "হাসান আপনি টেগোর পড়েছেন?"

জ্যোতির্ময় বললেন "ফালতু কথা বলার সময় আমার নেই অফিসার"।

তুষার বললেন "জনগণমন পুরোটা জানেন?"

জ্যোতির্ময় তেতো মুখে তুষারের দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "পাক সার জমিন পুরোটা জানেন?"

জ্যোতির্ময় উত্তর না দিয়ে অন্য দিকে তাকালেন।

তুষার বললেন "এত ঘৃণা নিয়ে বেঁচে থাকেন কী করে বলবেন?"

জ্যোতির্ময় বললেন "যেভাবে আপনাদের পলিটিশিয়ান বাপেরা বেঁচে থাকে। যেভাবে একটা ভোটের জন্য তারা মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরী করে। যে দেশে একটা মেথরের পোস্টের জন্য ডক্টরেটরা ফর্ম ফিল আপ করে, সেদেশের পলিটিশিয়ানদের কাজ হল কোথায় মন্দির হবে, কোন রাস্তা দিয়ে রাম লংকা গেছিল, কোন গরুর মুত খেলে ক্যান্সার সেরে যাবে, সেসব খোঁজা। ওরা বেঁচে থাকলে আমি কেন বেঁচে থাকতে পারব না?"

তুষার কয়েক সেকেন্ড জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন "ইউ নো হাসান, আপনার সঙ্গে আমার চিন্তাধারা অনেকাংশে মেলে। সেম জিনিস আমিও ভাবি। কিন্তু ডিফারেন্সটা হল আমার মনে হয়েছে তফাৎটা শিক্ষায়। আর আপনার মনে হয়েছে আপনি নিরীহ মানুষ মেরে সবাইকে শিক্ষা দেবেন"।

জ্যোতির্ময় বললেন "নিরীহ মানুষ? কোন শুয়োরের বাচ্চা নিরীহ এদেশে? প্রত্যেকটা, আই রিপিট, একশোতে নব্বইটা মানুষ কমিউনাল এই দেশে। গরু শুয়োরের পালে দশ বারোটা মরলে কিছু হয় না। বরং এতে জনসংখ্যা কমে"।

তুষার বললেন "আপনি টেগোরের দেশের লোক"।

জ্যোতির্ময় বললেন "টেগোর ইজ পাস্ট অফিসার। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও মানুষ এত কমিউনাল ছিল না যতটা এখন"।

তুষার হাসলেন "হু, দাঙ্গাগুলো তো হাওয়ায় হত! তবে হ্যাঁ, পঞ্চাশ বছর আগে এত জেহাদী শুয়োরের বাচ্চাও ছিল না"।

জ্যোতির্ময় চোখ লাল করে তুষারের দিকে তাকালেন "মুখ সামলে অফিসার"।

তুষার বললেন "যারা নিরীহ মানুষদের মারে, অসহায় নিরস্ত্র মানুষকে টার্গেট করে, তাদের জন্য খুব নিরীহ একটা গালাগাল দিলাম মিস্টার মাকসুদ। একটা পচা খাল দিয়ে যেমন শহরের নোংরা জিনিস যায়, আপনারা হলেন এই পৃথিবীর সেই ড্রেনের বদ রক্ত। আপনাদের মত জানোয়ারদের জন্য দেশের অর্থনীতিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের তুলনায় ডিফেন্সে বেশি টাকা বরাদ্দ করতে হয়। আপনি যে কারণে দেশের ওপরে রাগ করে জেহাদী হলেন, কখনও ভেবে দেখেছেন দোষটা কার ছিল? ঠিক কী কারণে অবৈধভাবে কাঁটাতার পার হবার দরকার পড়ল? কোন জান্নাত পাবেন আপনি নিরীহ মানুষদের খুন করে?"

জ্যোতির্ময় চুপ করে রইলেন।

তুষার বললেন "আপনাদের প্ল্যান ফেইল করেছে মিস্টার মাকসুদ। ঐ পাঁচজনকে শ্রীনগরে জেকাতোর প্ল্যান করেছিলেন তারা আপনার মতই আমাদের আদর খাবে এক্স ফর ইওর ইনফরমেশন মিস্টার মাকসুদ, এই অপারেশনটায় একই সাথে একজন কাশ্মিরী পন্ডিত এবং একজন কাশ্মিরী মুসলিম ছিল। তারা হাতে হাত মিলিয়ে এই গোটা ব্যাপারটা সাকসেসফুল করেছে। দিস ইজ ইন্ডিয়া, নেভার ফরগেট দ্যাট"।

জ্যোতির্ময় তুষারের দিকে তাকালেন। খানিকক্ষণ পর বিদ্রুপের হাসি হেসে বললেন "ইন্ডিয়ার অনেক কিছু দেখার আছে এখনও আপনার মিস্টার তুষার রঙ্গনাথন। অনেক কিছু"।

খান ঘরে ঢুকেছিলেন। তুষার কিছুক্ষণ জ্যোতির্ময়ের দিকে তাকিয়ে খানের দিকে তাকিয়ে বললেন "ওকে ওর স্ত্রীর ঘরে দিয়ে দাও। দুজনে মিলে শোক পালন করুক। দুপুর নাগাদ জেরা শুরু করব। সব ক'টা শুয়োরের বাসা খুঁজে বার করতে হবে"।

৫২।

বীরেন যখন বাড়ির কলিং বেল বাজাল তখন সন্ধ্যে সাতটা। বাঁ হাতে ব্যান্ডেজ। বাবা দরজা খুলে তাকে দেখে রাগী গলায় বললেন "এই তোর আসার সময় হল? একটা ফোন না কিছু না! ইন্টারভিউ দিয়ে তো একেবারে উলটে দিলি তুই!"
মা তাকে দেখেই এসে চেঁচিয়ে উঠলেন "হাতে কী হল তোর! কী করলি এসব?"
বীরেন বলল "বাসে পড়ে গেছিলাম"।
মা বললেন "চল চল, চুন হলুদ গরম করে দি"।
বাবা বললেন "কিচ্ছু দিতে হবে না, পুরুষ মানুষ। সব ঠিক হয়ে যাবে। বীরে ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে?"
বীরেন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। বাবা বললেন "এই দেখো পাগল ছেলে! কী রে কী শুরু করলি? বাইরের পোশাক পরে, এই দ্যাখো কী কাণ্ড!"

মা রাগ করলেন "হ্যাঁ, এখন তো বাবাকেই আদর করবি, তাই সই। আমি তো বানের জলে ভেসে এসছি, হ্যাঁরে এই ব্যাগটা কোত্থেকে কিনলি?" মার চোখ পড়ল তার ব্যাগের ওপর।
বীরেন বলল "যেখানে ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম, সেখান থেকে দিয়েছে"।
মা বললেন "ঠিক আছে, যা হাত মুখ ধুয়ে আয়। মুড়ি মেখেছি, খেয়ে নে"।
বীরেন ঘরে গিয়ে ব্যাগটা রাখল। দরজা বন্ধ করে ব্যাগ থেকে একটা খাম বের করল। প্লেনে ওঠার সময় অবন্তী সান্যাল নিজের হাতে দিয়ে বলেছিলেন "একটা মেসেজ আছে, বাড়ি গিয়ে পড়"।
বীরেন দেখল কাগজটায় একটা ছোট্ট মেসেজ "দুদিন রেস্ট নিয়ে নাও। তারপর কলকাতার অফিসে রিপোর্ট কোর। স্বাং পি এম সাহেবের থেকে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার চেয়ে নিয়েছি। থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভ্রিথিং এন্ড আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি দ্যাট ইউ ফেইলড দ্যাট এক্সাম ডেসপাইট ইউ ওয়ার পারফেক্টলি এলিজিবল ফর আস। ওয়েলকাম টু ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ইয়াং ম্যান- তুষার রঙ্গনাথন"।

*

দিল্লির ফ্লাইটে নিজের সিটে বসলেন তুষার।

মাথুর কানে কানে বললেন "স্যার ব্যাড নিউজ"।

তুষার ভ্রু কুঁচকালেন "কী?"

মাথুর বললেন "পাকিস্তানি মিডিয়া আফসানা সাঈদের হত্যা নিয়ে তুলকালাম করছে। বলছে স্পাই হলেও আফসানা সাঈদকে মেরে ইন্ডিয়া ঠিক করে নি"। তুষার কয়েক সেকেন্ড জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। তারপর মাথুরের দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠে বললেন "মরুক গে যাক"।

(শেষ)

এই কাহিনীর সব কিছু কাল্পনিক। কোন ঘটনার সঙ্গে কাহিনীর কোন কিছু মিলে গেলে তা পুরোটাই কাকতালীয়। আশা করি বিদগ্ধ পাঠক তা বুঝতে পারবেন।

ধন্যবাদ

লেখক